হিমাচল

অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

৭ম সংখ্যা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান করেছেন : মোঃ রোকনুজ্জামান রনি

এডিট করেছেন : রনি ও সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

প্রগতিশীল শিশু মাসিক পত্রিকা

১ম বর্ষ | ৭ম সংখ্যা | প্রতি সংখ্যা ।৶০

হিমাচল

অগ্রহায়ণ | ১৩৬৩ | বার্ষিক ৪৲

সম্পাদক—শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
সহকারী---শ্রীজয়শ্রী বসু

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক ও লেখিকা	পৃষ্ঠা
১। হেমন্তে	(কবিতা)	শ্রীসুধীর কুমার রায়	৩৬৯
২। জলের উপর ট্রেন	(পাদপূরণ)	মাধব পাল	৩৭০
৩। আলফ্রেড বার্ণহার্ড নোবেল	(জীবনী)	প্রতুল কুমার দাস	৩৭১

বিক্রয় কেন্দ্র—১৬১।১ অপার
চীৎপুর রোড, (মদনমোহনতলা)

যুগবার্ত্তা

০০ঃ প্রগতিশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকা ঃ০০

আগামী শীত সংখ্যায় লিখছেন :—

কবিশেখর কালিদাস রায়, শিল্পী সাহিত্যিক দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী; উদাও ভারতএর কবি বিমল চন্দ্র ঘোস, বাণী রায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র; বিনয় ঘোষ, খগেন মিত্র,, শুদ্ধসত্ব বসু, অধ্যাপক ভোলানাথ ঘোস ও আরও অনেকে।

যোগাযোগ করুণ :---

যুগবার্ত্তা
বাঘা যতীন পল্লী
কলিকাতা-৩২

৪।	অবুঝ	(কবিতা)	শ্রীসখা	৩৭৩
৫।	ডোরা কাটা সার্ট	(ভৌতিক গল্প)	অধীর দাস	৩৭৪
৬।	এক মিনিটে জবাব দাও	(পাদপূরণ)	—	৩৭৬
৭।	পল্লী পানে চল্	(কবিতা)	হেমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৭৭
৮।	দুটি কথা	(পাদপূরণ)	—	৩৭৮
৯।	গল্প নয় (৩)	(ঐতিহাসিক প্রবন্ধ)	প্রদীপকুমার	৩৭৯
১০।	একটু খানি ভাবো	(পাদপূরণ)	—	৩৮২
১১।	ধনপতি-উপাখ্যান	(ঐতিহাসিক প্রবন্ধ)	প্রদ্যোত কুমার সেনগুপ্ত	৩৮৩
১২।	ইছামতীর চরে	(কবিতা)	সুনির্ম্মল নায়ক	৩৮৭
১৩।	হাসবে ?	(কৌতুক-টিপ্পনী)	—	৩৮৮
১৪।	খেলাধুলার কথা	(সাময়িক পর্য্যালোচনা)	সুনীল বসু	৩৮৯
১৫।	হাবসীর রাজা হাইলে সেলাসী	(চিত্র গ্রহণ)	—	৩৯৬
১৬।	দি প্রিন্স এণ্ড দি পপার	(অনুবাদ সাহিত্য)	দুর্গাপদ তরফদার	৩৯৭
১৭।	তুফান	(গোয়েন্দা কাহিনী	শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	৪০১
১৮।	মিশর আক্রমণ	(ঐতিহাসিক প্রবন্ধ)	শ্রীজয়শ্রী বসু	৪০৫
১৯।	আমাদের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য কথা		শ্রীসুজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায়	৪০৮
২০।	গড়গড়া গাঙ্গুলীর গল্প		---বীরু চট্টোপাধ্যায়	৪১০
২১।	রেল দুর্ঘনার খতিয়ান	(পাদপূরণ)	---	৫১৩
২২।	বিষ্ণুশর্ম্মার গল্প (২)	---	মায়া তরফদার	৪১৪
২৩।	রাক্ষুসে সাপ	(পাদপূরণ)	---	৪১৬
২৪।	রঙীন পাতা	(ছোটদের আসর)	পরিচালিকা দিদিভাই	৪১৮
	(১) রেলগাড়ী	(কবিতা)	সুমিত গাঙ্গুলী	৪১৮
	(২) একটি ছোট গল্প	(গল্প)	শ্রীনিলু	৫১৯
	(৩) তোমাদের চিঠির উত্তর	---	---	৪২০
	(৪) ধাঁধা	---	---	৪২১
২৫।	খবর বলছি	---	---	৪২২

সোল ডিষ্ট্রিবিউটর---**জানকী বুক ডিপো**

৩।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ

এক বাক্যে বলেন—

শ্রীহৃদয়রঞ্জন তালুকদার **(H. R. Talukder)** প্রণীত বিদ্যালয়-পাঠ্য ইংরাজি-বাংলা বিভিন্ন অর্থপুস্তকগুলি পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। আমরা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদিগকে সর্ব্বদা **H. R. Talukder** প্রণীত অর্থপুস্তকগুলি পড়িতে উপদেশ দেই। কারণ এগুলি সহজ, সরল ও নির্ভুল ;— শুধু তাহাই নহে, এগুলিতে প্রয়োজনীয় বিষয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশ রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমুদয় পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

প্রকাশক :—

জানকী বুক ডিপো

৩।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের একখানি

অনবদ্য গল্পগ্রন্থ

শিলানগরের রাণী

আপনার মনের খোরাক যোগাতে

অদ্বিতীয় পুস্তক

দুই টাকা।

আমাদের প্রকাশিত

অধুনাতম গল্পগ্রন্থ

"দেশ" "আনন্দবাজার" "যুগান্তর"
পত্রিকা কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত
দেবকুমার ঘোষের

ে ঘ সুন্দর

বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের
হাতে তুলে দেবার মত একখানি
আদর্শবাদী গল্পসংকলন

এক টাকা চার আনা

মায়া মানবীর দেশে

রোমাঞ্চকর ভ্রমন-কাহিনী

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।
মূল্য ১৲ টাকা।

পরিবেশক—জানকী বুক ডিপো ৩।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হিমাচল

প্রথম বর্ষ | অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ | সপ্তম সংখ্যা

হেমন্তে

শ্রীসুধীর কুমার রায়

ঘোলা ঘোলা আকাশে
শিরশিরে বাতাসে
জানায় যে আভাসে
হেমন্ত আসলো,

বয়ে এনে ঝোলাতে
ভরে ধান গোলাতে
দুঃখ সব ভোলাতে
হেমন্ত এলোরে,

ধানে ধানে বাজনি
হৃদয়ের নাচান
হাতে নিয়ে কাটনি
কৃষাণেরা হাসলে।

সোনা রঙা ধানেতে
ঝুরু ঝুরু গানেতে
হরষ যে প্রাণেতে
ফিরে আজ পেলোরে।।

বছরের খাটুনি
জলে ভিজে কাঁপুনি
মাঠে মাঠে যাপনি
হলো বুঝি অন্ত,

ফসলের ফলনে
চলনে ও বলনে
আজি এই লগণে
চাষী পয়মন্ত

জলের উপর ট্রেন—ইউরোপে বাল্টিক সাগরের উত্তরে ডেনমার্ক রাজ্য—তার রাজধানী কোপেনহাগেন শহর বাল্টিক সাগরের তীরেই অবস্থিত। আর বাল্টিক সাগরের দক্ষিণে হলো জার্ম্মাণীর বিখ্যাত শিল্প শহর হামবুর্গ। সেখান থেকে দুটি রেল লাইন গিয়েছে বাল্টিক সাগরের দিকে। একটি সমুদ্র পারের বন্দর রষ্টক পর্য্যন্ত অপরটি একেবারে বাল্টিক সাগরের কূলে কিয়েল ষ্টেশন পর্য্যন্ত।

হামবুর্গ থেকে সরাসরি ট্রেনে ডেনমার্ক যেতে এই কিয়েল ষ্টেশন হয়েই যেতে হয়। আর যেতে হয় ঠিক ট্রেনে চেপে বাল্টিক সাগরের উপর দিয়ে।

হামবুর্গ থেকে ডেনমার্ক-গামী ট্রেন গিয়ে থামবে সাগর পারে ষ্টেশন কিয়েলে। এদিকে ষ্টেশন সংলগ্ন সাগর বন্দরে একটি লম্বা বড় জাহাজ নোঙ্গর করা থাকে। সেই প্রকাণ্ড জাহাজের উপর রেল লাইনের পাত বসান আছে। সেই জাহাজের লাইনের সাথে আর দুটি রেলের লাইন যোগ করে দেওয়া হয় মাটীর উপর রেল লাইনের সাথে।

এবার ট্রেনটি সমস্ত কামরা সহ লাইনের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে যায় সেই লম্বা জাহাজের উপর। তারপর বাল্টিক সাগরের বুকে ট্রেন শুদ্ধ জাহাজ চলতে থাকে—ডেনমার্কের সমুদ্র বন্দর ও রাজধানী কোপেনহাগেনের দিকে। সাগরের উপর দিয়ে চলার সময় ট্রেনের জানালা দিয়ে দূরে তাকালে মনে হবে জলের উপর দিয়েই টে ন চলছে।

এই ব্যবস্থার সুবিধা হচ্ছে যে, যাত্রীদের আর মালপত্র নিয়ে গাড়ী ছেড়ে জাহাজে অথবা জাহাজ ছেড়ে গাড়ীতে উঠবার সময় কোনরূপ ব্যস্ততা বা অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। শিল্প ও বিজ্ঞানের সমৃদ্ধির ফলে অনায়াসে যাত্রী সহ ট্রেনকে সাগরের উপর দিয়ে নিয়ে যায় সাগর পারে অন্য রাজ্যে।

—মাধব পাল

আলফ্রেড বার্ণহার্ড নোবেল

(নোবেল পুরস্কার প্রবর্ত্তক)

প্রতুল কুমার দাস

মানব দেহ নশ্বর। জীবনের গোনা দিন কটা ফুরিয়ে গেলেই আবার পঞ্চ ভূতে মিশে যায় এই নশ্বর দেহ। কিন্তু কীর্ত্তি অবিনশ্বর। কালের উর্দ্ধে তার স্থায়ীত্ব। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কীর্ত্তিমান মহাপুরুষেরা মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমা অর্জন করেন। তাঁদের সংখ্যা আঙ্গুল দিয়ে গোনা যায়। আলফ্রেড বার্ণহার্ড নোবেল বিশ্ববরেণ্য মনিষীদের তালিকাভুক্ত। এই বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ নোবেল পুরস্কার প্রবর্ত্তন করে যান। প্রতি বৎসর পুরস্কার ঘোষণার মাধ্যমে আমরা এই মহাপুরুষের নাম করে থাকি। মৃত্যুর পরেও তিনি অমর হয়ে আছেন মানুষের স্মৃতি-ফলকে।

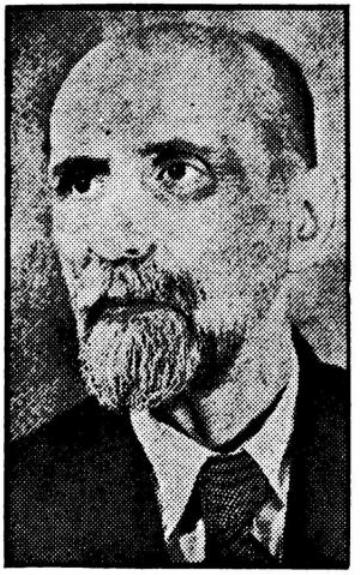

জুয়ান র‍্যামন জিমেনেজ্—ইনি একজন স্পেন দেশীয় কবি, ১৯৫৬ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজের অধিকারী হয়েছেন। কবির বয়স ৭৪ বৎসর।

১৮৩৩ খৃঃ ২১শে অক্টোবর সুইডেনের অন্তর্গত ষ্টক্‌হোমে আলফ্রেড বার্ণহার্ড নোবেল জন্মগ্রহণ করেন। ঐশ্বর্য্য ও আভিজাত্যের মধ্যে তাঁর জন্ম। পিতা ইমানুয়েল নোবেল ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন আবিষ্কারক। বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার অপরিহার্য্য দ্রব্য "প্লাইউড" তিনি আবিষ্কার করেন এবং এই দ্রব্যের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনও করেন। ইমানুয়েল নোবেল ছিলেন অস্থির প্রকৃতির লোক; একস্থানে তিনি বেশীদিন থাকতে পারতেন না। নানা জায়গায় ঘুরে তিনি প্রাচীন রাশিয়ার রাজধানী সেণ্ট্‌পিটার্সবুর্গে (বর্ত্তমান লেলিনগ্রাড) এসে বসবাস করতে সুরু করেন। এইস্থানে অবস্থানকালে তিনি সাবমেরিনের প্রভূত সংস্কার সাধন করেন। এতে তদানীন্তন রাশিয়ার সম্রাট জার

খুসী হয়ে ইমানুয়েলকে একটি সুসজ্জিত আধুনিক গবেষণাগার স্থাপন করে দেন। তারপর থেকে তিনি স্থায়ীভাবে রাশিয়ায় বসবাস করেতে থাকেন। ছোট থেকেই আলফ্রেডের পড়াশুনার (অবশ্য স্কুলের বাঁধাধরা পড়াশুনা) দিকে তেমন ঝোঁক ছিল না। কেবল সারাদিন পিতার গবেষণাগারে থেকে মনোযোগ দিয়ে পিতার কাজ লক্ষ্য করতেন। পিতাও পুত্রের অভিপ্রায় জানতে পেরে নিজের কাছে রেখে প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে সুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আলফ্রেড রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। ক্রমশঃ আলফ্রেড পিতার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হয়ে উঠলেন। কিন্তু পিতার কাছে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার আগেই পিতা তাঁর ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন। পিতার মৃত্যুতে আলফ্রেড কিছু পরিমাণে মুষড়ে পড়েন। কিন্তু মাতার উৎসাহে তিনি আবার বিজ্ঞান সাধনায় মনোনিবেশ করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নাইট্রোগ্লিসারিণ নামক এক প্রকার অতি দাহ্য পদার্থ সহযোগে বর্ত্তমান সভ্যতার অতি মূল্যবান দ্রব্য "ডিনামাইট" আবিস্কার করেন। "ডিনামাইট" ব্যবসায়ে তিনি প্রভুত অর্থ আয় করেন। পিতার চঞ্চল প্রকৃতি পুত্রের জীবনেও কার্য্যকরী হয়েছিল। আলফ্রেডও নানা স্থানে লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অবশেষে নিজ জন্মভূমি ষ্টক্‌হোমে ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করেন।

অত্যন্ত পরিশ্রম করার ক্ষমতা ছিল আলফ্রেডের; সারাদিন কোন না কোন কাজ নিয়ে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু নানা কাজের মধ্যেও তিনি মায়ের কথা ভুলতেন না। তিনি ছিলেন ভীষণ মাতৃভক্ত সন্তান। কোন কাজ সুরু করবার পূর্বে তিনি মায়ের অনুমতি গ্রহণ করতেন। তাঁর "ডিনামাইট" কারখানায় প্রায় ২৫০০০ কর্মচারী কাজ করতো। তাদের তিনি নিজের সন্তানের মতই স্নেহ করতেন। প্রতিটি শ্রমিকও তাঁকে পিতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন।

দীর্ঘজীবনের স্বোপার্জ্জিত অর্থ তিনি বিজ্ঞানের এবং সংস্কৃতির উন্নতির জন্য ব্যয় করে গেছেন। বিজ্ঞান মানুষের জীবনে অভিশাপ না হয়ে আশীর্ব্বাদ হয়ে উঠুক এই ছিল আলফ্রেডের একান্ত কামনা। বিজ্ঞান মানব সভ্যতার ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত হোক তা তিনি চাইতেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ২০ লক্ষ টাকার মূলধন দিয়ে নোবেল পুরস্কারের তহবিল সৃষ্টি করে যান। প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ টাকার যে সুদ হবে তার উপরে বিভিন্ন বিভাগে ৫ টি পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করে যান। এই পাঁচটি বিভাগ হচ্ছে :—

(১) সাহিত্য, (২) শান্তি, (৩) রসায়ন শাস্ত্র, (৪) পদার্থ বিদ্যা, (৫) শরীর বিদ্যা। তিনি তাঁর উইলে লিখে যান—"জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রতি বৎসরে এই পাঁচটি বিভাগে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের একটি করে পুরস্কার দেওয়া হবে।" আলফ্রেডের জন্মদিবসে (২১শে অক্টোবর) পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং তাঁর মৃত্যু দিবসে (১০ই ডিসেম্বর) উক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হয়ে থাকে। সর্ব্বপ্রথম এই পুরস্কার দেওয়া হয় ফরাসী কবি সুলি প্রুডুমকে ১৯০১ খৃঃ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পর থেকে। ১৮৯৬ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন।

বিশ্বের অন্যান্য যে কোন পুরস্কার থেকে নোবেল পুরস্কার আর্থিক বা সম্মানের দিক থেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অবুঝ

—শ্রীসখা

জীবনের লক্ষ্য কি যে বুঝি নাকো
চলি শুধু অবুঝের মত,
অসংখ্য কাজের মাঝে—অদম্য মনের তৃষা
মিটাইতে চাহি অবিরত।
অন্তঃসলিলা প্রেম বহে নাকো সমুখের পানে
রহে ঢাকা—জীবনের ক্ষত,
বেদনাই ভেসে চলে প্রবলের টানে
প্রাণ গঙ্গা উথলিয়া যত।

ডোরাকাটা সার্ট

(ভৌতিক গল্প)

অধীর দাস

শহর ছাড়িয়েই ঝিলের সুরু, মাঝখানে আঁকাবাঁকা রাস্তাটা ঝিলকে দুপাশে রেখে চলে গেছে সামনে। প্রায় দু' তিন মাইল রাস্তা পেরিয়ে তারপর গাছপালার হদিশ পাওয়া যায়। দূরে দূরে দু' চার খানা বাড়ীও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।

দিনের বেলা ঝিলের আশে পাশে ঝোপ ঝাড়ের কাছে দু চারটে বক মাছের আশায় চুপ করে বসে থাকে। মাঝে মাঝে দু এক ঝাঁক গাংশালিক পাক খেয়ে উড়ে যায় ঝিলের উপর দিয়ে। এই যা কিছু আলোড়ন তা ছাড়া এখানের সবকিছু যেন স্তব্ধ ও অচঞ্চল চিত্তে কার অপেক্ষা করছে।

আর দেখা যায় দু চার জন লোককে যারা হয়তো দূর গাঁয়ের বাসিন্দে। কোন বিশেষ কারণে শহরে এসেছিল, এছাড়া অন্য লোক বড় একটা দেখা যায় না পথে।

কিন্তু রাত্রের রূপ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। জ্যোৎস্নায় ঝিলের জল যেন মুখ তুলে হাসতে থাকে। পাখীর ডাকে পরিপূর্ণ থাকে সর্ব্বদা। বহুদূর থেকেও অনেক অজানা পাখীর উচ্চ ডাক কর্ণগোচর হয়। চারিদিকে জ্যোৎস্নার ঝলমলানিতে যেন কেমন মায়াময় রূপের সৃষ্টি করে। নির্জ্জন—সম্পূর্ণ নির্জ্জনতা বিরাজ করে সর্ব্বত্র।

কিন্তু এই সুন্দর পরিবেশে কেউ কি কখনো কল্পনা করতে পারে, সন্ধ্যার পর এই স্থানটায় মানুষের প্রবেশ নিষেধ। নিস্তব্ধ রাত্রে কোন অশরীরির আত্মার আবির্ভাব কল্পনা করতে পারে কেউ? কিন্তু কেউ না পারলেও আমি পারি, আর আমিই দুচোখে তা প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

মফঃস্বল শহর; লোকসংখ্যা বলতে গেলে নেহাতই কম। বিশেষতঃ অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশী। অধিকাংশ লোক চাষ-বাস করে সংসার চালায়। সুতরাং ক্লাব বা আড্ডা দেবার ঘাঁটি এখানে নাই বললেও চলে। সুতরাং এখানে নূতন এসে দুচার দিন ঘোরাঘুরি করার পর যখন আর কিছু ভাল লাগছিলো না তখনই ক্লাব ইত্যাদির অভাব অনুভব হলো আমার কাছে। কিন্তু পাওয়া যায় কোথায়?

সাইকেলে চড়ে এধার ওধার ঘুরে বেড়ানো ছাড়া মন হাল্কা করবার উপায় আর কিছুই ছিলনা।

বিকেলের ফুরফুরে হাওয়ায় শহর ছাড়িয়ে ঝিলের উপরের আঁকাবাঁকা রাস্তার উপর দিয়ে অনেকদূর চলে যেতাম—চলে যেতাম লোকালয় ছাড়িয়ে অনেক দূরে।

পরন্তু বিকেলের ছায়া-শীতল পরিবেশে মনে কিসের যেন আমেজ লাগতো। দুপাশে শিশু ও মেহগিনি গাছের ডালপালা রাস্তার উপরে নেমে এসেছে। যেন মনে হত রোদ বৃষ্টির হাত থেকে রাস্তাকে বাঁচাবার জন্য পাতারা আচ্ছাদন রচনা করেছে, কেমন ঝিরঝিরে হাওয়া চারিদিকে—যেন শরীর মন জুড়িয়ে দিত। আসন্ন সন্ধ্যার যে আবছা অন্ধকার চারিদিকে ঘিরে এসেছে তা মনেই হত না। কোথায় কতদূরে যে চলে যেতাম তা খেয়ালই থাকতো না। চক্রের আবর্ত্তনে পৃথিবীপৃষ্ঠ ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যেতাম।

এমনিভাবে চলতে চলতে একদিন অনেক রাত হয়ে গেল। ফেরার কথা এতক্ষণ একদম মনেই ছিল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। খেয়াল মতই সাইকেলের মুখ ঘুড়িয়ে সোজা শহরের দিকে ছুটে চললাম।

চারিদিক গাছপালায় ঢাকা, তার মাঝে চন্দ্রের আলোক এসে রাস্তার উপর পড়ছিল তাতেই সবকিছু আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

পথ ফুরোবার নাম নেই। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম দশটা বেজে গেছে। চারিদিক নির্জ্জন। আমি কোথায়, কতদূরে, তা কে বলতে পারে? চারিদিকে বাড়ীঘর, লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। আর এখানে লোকজনের আশা করাও দুরাশা। শুধু মাঝে মাঝে দু একটা পাখীর তীব্র চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার মনের মধ্যে কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। ভগবানের নাম স্মরণ করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসার চেষ্টা করতে হলো। অবশেষে একসময় ঝিলের কাছাকাছি এসে পৌঁছুলাম। এবার ঝিলটা পেরিয়ে গেলেই শহর। মনে মনে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম।

কিন্তু সামনে দৃষ্টি পড়তেই আশ্চর্য্য হলাম। একটা লোক ঝিলের রাস্তার উপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। একটু দূরে এগিয়ে স্পষ্টই দেখতে পেলাম ডোরাকাটা সার্ট গায়ে এক যুবক সাইকেলের আরোহী। আমার বেশ ভালই লাগলো। যাহোক একজন সঙ্গীতো পাওয়া গেল। ভাবলাম আমারই মত হয়তো কোথাও ঘুরতে বেড়িয়েছিল। আমি জোরে জোরে প্যাডেল করে ওকে ধরে ফেলবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমাকে জোরে চালাতে দেখে যুবকটিও জোরে জোরে সাইকেল চালাতে লাগলো। আমি অনেক চেষ্টা করেও ওকে ধরতে পারলাম না।

প্রায় মাইল দেড়েক রাস্তা ওর পিছনে পিছনে এগিয়ে গেলাম কিন্তু ও এত তাড়াতাড়ি চালাল যে কিছুক্ষণ পরে আর ওকে দেখাই গেল না। লোকটার সাইকেল চালানোর তারিফ করতে হয়।

পরের দিন বিকেলে আবার সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছি। আগের দিনের কথা আর কিছুই মনে নেই। আজকেও ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। ফেরার মুখে আবার—সেই দুধারে ধানের গুচ্ছ। ঘন-বৃক্ষের আচ্ছাদন সব—সবকিছু পেরিয়ে একসময় ঝিলের কাছে এসে গেলাম। মনটা আশ্বস্ত হ'ল। যাহোক এবার ঝিল পেরোলেই·····

কিন্তু ওকি ও কে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে আগে আগে? ডোরাকাটা সার্ট গায়ে। কালকের সেই লোকটাইতো। আমি আশ্চর্য্য হলাম। আশ্চর্য্য যোগাযোগ তো। কিন্তু আজ আমার রোখ চেপে গেল। যে করে হোক ওকে আজ ছাড়িয়েই যেতে হবে। আমি প্রাণপণে সাইকেল চালাতে আরম্ভ করলুম।

ধরে ফেলেছি প্রায়। আর একটু একটু হলেই একদম পাশাপাশি। বোধহয় হাত পনেরোর বেশী হবে না।

কিন্তু একি! কোথায় সাইকেল কোথায় আরোহী! কিছুই নাই। আমি সামনে পিছনে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কোথায় গেল সাইকেল আরোহী?

কিন্তু না—ঐতো কিছু সামনে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে সে। আমি হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে চোখ দুটো রগড়ে নিলাম। মাথাটা ঝাকড়ে নিলাম দুবার। না সত্যিইতো আমারই হয়তো ভুল হয়েছিল। অন্ধকারে দেখতে পাইনি হয়তো।

কিন্তু এবারে আর ছাড়াছাড়ি নেই। আমি ওকে চীৎকার করে ডাকলুম। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ দিল না লোকটা।

তবুও ধরা চাইই ওকে। এইতো এসে গেছি। আর একটু আর মাত্র হাত দশেক। প্রায় ছুঁই ছুঁই। কিন্তু ওকি। আরোহী কোথায়। মস্তকহীন শুধু একটা ডোরাকাটা সার্ট সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। আমার চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। আমি চীৎকার করতে গেলাম কিন্তু কে যেন একটা বিরাট সাঁরাশী দিয়ে আমার কণ্ঠনালীকে জোরে চেপে ধরেছে। জোরে আরো জোরে। আচ্ছন্ন হয়ে সাইকেল থেকে পড়ে গেলাম। তারপর আর আমার কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হল আমার পরদিন শহরের হাসপাতালে। শুনলাম শেষরাত্রের দিকে ঝিলের রাস্তায় অজ্ঞান অবস্থায় সাইকেলের উপর পড়ে থাকতে দেখে আমায় কে তুলে নিয়ে আসে। এখানে পৌঁছে দিয়েই চলে গেছে। কোন ঠিকানাও রেখে যায়নি।

আমার শরীরের দুর্ব্বলতা কাটতে বেশ কিছুদিন লেগেছিল। তারপর ঘটনার পরে অনেকদিন চলে গেছে। কিন্তু সেই মস্তকহীন ডোরাকাটা সার্ট আর অজ্ঞাত ব্যক্তির রহস্য আজও ভাবিয়ে তুলছে আমাকে।

এক মিনিটে জবাব দাও

যদি ৫টি বিড়াল ৫ মিনিটে ৫টি ইঁদুর ধরতে পারে, তবে ১টি বিড়াল ১টি ইঁদুর ধরবে কয় মিনিটে?

[উত্তর শেষ পাতায়।

পল্লী পানে চল্

হেমন্ত কুমার বন্দোপাধ্যায়

বাংলা দেশের দামাল ছেলে পল্লী পানে চল্
শরৎ আকাশ হাতছানি দেয় চল্‌রে দলে দল্ !
বনের কুসুম রাতের তারা
জাগ্‌ছে সবাই আপন হারা
কমল বনে গন্ধে পাগল উড়ছে অলি দল্
এবার সবে দলে দলে পল্লী পানে চল্ !

সবুজ ধানের ক্ষেতে সেথা হীরিৎ গোলা লাগে
বন-বীথির বুকে কত পুষ্প-পরী জাগে।
প্রজাপতি রঙিন পাখায়,
বন-ফুলের রেণু মাখায়,
রাখাল ছেলে বাজায় বেণু গোধন চলে আগে—
সবুজ ধানের ক্ষেতে সেথা হরিৎ গোলা লাগে।

বাংলা দেশের দামাল ছেলে পল্লী পানে চল্,
দেখ্‌বি যদি মাকে আজি চল্‌রে দলে দল্ !
শীস্ দিয়ে আজ সজনে শাখে,
বুলবুলি তার চরণ রাখে,
কাঠবিড়ালি মনের সুখে বাজায় করতল
এবার সবে দলে দলে পল্লী পানে চল্ !

সেথায় কত সোনার ছেলে ধুলায় আছে লুটে
লক্ষ্মী মেয়ে কত সেথায় দীঘির জলে জুটে।
হাজার হাজার গল্প যত,
ঘুমিয়ে আছে সেথায় কত,
ব্যাঙ্গামা আর ব্যাঙ্গামিতে বটের ডালে বসে
গল্প করে সারারাতি আপন মনে হেসে।

বাংলা দেশের দামাল ছেলে পল্লী পানে চল্
হাতছানিতে ডাকছে ওরা, হাসিতে উজল্।
নদীর জলে সাতার কেটে,
বনবাদাড়ে দেদার হেঁটে,
সোনার ছেলে গায়ে মনে রাখবে অসীম বল
এবার সবে দলে দলে পল্লী পানে চল্!

॰ঃ৪৪ঃ॰ দুটি কথা ॰ঃ৪৪ঃ॰

সংস্কৃত সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র। পৃথিবীতে যে কয়টি শ্রেষ্ঠ নীতিগ্রন্থ আছে, নিঃসন্দেহে পঞ্চতন্ত্র তাদের মধ্যে অন্যতম। পঞ্চতন্ত্রের মত বহু ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ জগতে বিরল। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা মহিলারোপ্য নগরের রাজপুত্রদের নীতি শিক্ষার জন্য এই অমূল্য গ্রন্থটি রচনা করেন। মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলুক্য, লব্ধনষ্ট ও অসম্প্রেক্ষকারিতা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ব'লে নাম এর পঞ্চতন্ত্র। নওসেরোয়ান ৫৩১ খ্রীঃ থেকে ৫৭২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ছিলেন পারস্যের অধিপতি। ইনি ছিলেন পরম বিদ্যানুরাগী। এঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পঞ্চতন্ত্র আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। পরে পারসিক অনুবাদ থেকে হয় এর হিন্দী তর্জমা। তৎকালিক প্রায় সারা এশিয়ায় পঞ্চতন্ত্রের এরূপ প্রসার ও প্রচার দেখে সেমিয়ানসেট নামে এক গ্রীক দার্শনিক-কবি ১০৮০ খ্রীঃ আরবী থেকে পঞ্চতন্ত্রের করেন গ্রীক অনুবাদ। 'বিষ্ণুশর্মা'কে আরবীয়রা 'বিদপাই'

[শেষাংশ ৩৮৬ পৃষ্ঠায়]

গল্প নয় (৩)

প্রদীপকুমার

(ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা)

বিজয় উল্লাসে উন্মত্ত হানাদারের দল হু হু করে ছুটে আসছে রাজধানী শ্রীনগরের দিকে। মহারাজার বাধা দেবার কোনই নুতন ব্যবস্থা এখনো হলো না। ভারত সরকারই বা মহারাজার অনুরোধে কি জবাব দিলো কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না। ভীত সন্ত্রস্ত দেশবাসী কাতর-নয়নে চেয়ে আছে একটা কিছুর আশায়। ধন, প্রাণ, মান সবইতো গেল—এখন তাদের সাধের দেশ ও যেতে বসেছে উপজাতি গুণ্ডাদের হাতে।

দেশ তাদের ছোট, কিন্তু অতীতের ইতিহাস তাদের ছোট নয়। মহাকবি কহ্লাণ কাব্যে কশ্মীরের অতীত ইতিহাস রচনা করে গেছেন। সংস্কৃত ভাষায় কহ্লাণ কাশ্মীরের হিন্দুরাজাদের গৌরবময় জীবন কথা সুললিত ছন্দে গেঁথে রেখেছেন। এই দুর্লভ কাব্য গ্রন্থের নাম "রাজ তরঙ্গিণী"।

রাজ তরঙ্গিণী কাব্যে প্রাচীন কাশ্মীরের রাজনীতি বা সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ নেই। রাজাদের চার হাজার বছরের কীর্ত্তি কাহিনীই এই কাব্যের বিষয় বস্তু। তাই থেকে আমরা জানতে পারি, কাশ্মীরের পিছনে একটি অতি প্রাচীন কিন্তু গৌরবময় ইতিহাস আছে।

পৃথিবীর ৩২ থেকে ৩৭ উত্তর এবং ৭৩ থেকে ৮০ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় কাশ্মীর জম্মু রাজ্য অবস্থিত। কাশ্মীর জম্মু রাজ্যের আঞ্চলিক বিভাগ তিনটি। উপরিভাগের অংশ সিন্ধুনদ ও তার কয়েকটা শাখা, মধ্য অংশ আছে ঝিলাম আর কৃষ্ণভাগা নদী আর নিম্নাংশে হিমালয়ের পার্ব্বত্য ভূমি। যোজিলা আর পাঞ্চাল পর্ব্বত রেখা এই আঞ্চলিক বিভাগগুলির উপর স্পষ্ট করে দাগ টেনে রেখেছে। রাজ্যের পরিসীমা ৮৪,৪৭১ বর্গমাইল লোকসংখ্যা ৪০,২১,৬১৩ (১৯৪১ সালের আদম সুমারি অনুযায়ী)। কাশ্মীর রাজ্য চারিদিকে ঘন পাহাড় ঘেরা।

প্রকৃতি অফুরন্ত হাতে সাজিয়েছে কাশ্মীরকে। পাহাড়, নদী, নালা, গাছ গাছালিতে ভরে আছে এদেশ। এখানে সমতল ভূমির বালাই নেই, যাওয়া আসার রাজপথ নেই—

কাজে কাজেই বহুদিন থেকেই অবশিষ্ট পৃথিবী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো কাশ্মীর। পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের দরকারও বোধ করেনি অধিবাসীরা। শস্য আছে প্রচুর, বাগানে আছে ফল ফুলুরি। স্থলে, জলে, গগনে, পাহাড়ের মাথায় মাথায় সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ করে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত প্রকৃতির উছলিত হাসির ঝিলিক খেলে যায়। এতেই সন্তুষ্ট এরা। শিক্ষার অভাব এরা বোধ করে না। রাজনীতিও এরা বোঝে না। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের কোন দরকার ছিলো না এদের।

ডোগরা রাজবংশের রাজত্ব কালে প্রথম এখানে রাজপথ তৈরী হলো বাণীহাল কার্ট রোড আর ঝিলাম ভ্যালী রোড। তখন বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কিছুটা যোগাযোগ এদের স্থাপিত হলো।

কাশ্মীর রাজ্যকে যদি ভালভাবে লক্ষ্য করা যায় তাহলে বেশ বোঝা যায় যে এর স্থলভাগ দুরকমের। কিছুটা সীমান্ত আর কিছুটা উপত্যকা প্রদেশ। সীমান্তের একদিকে আছে গিলগিট, আর লাডাক, আর একদিকে আছে মজফরাবাদ। উপত্যকার দিকে আছে বারমুল্লা আর অনন্ত নাগ—এর মধ্য দিয়েই শান্ত-সলিলা ঝিলাম প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সীমান্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ, তাই এখানকার অধিবাসীরা কর্ম্মঠ আর বছরের বারোমাসই এদের বরাতে তুষারের দর্শন লাভ ঘটে।

উপত্যকার অধিবাসীরা শান্তিপ্রিয় চাষী। গ্রীষ্মকালে এরা ভুট্টা আর ধানের চাষ করে। আর শীতকালে বোনে কাশ্মীরী শাল আর কাশ্মীরী কাপড়।

কাশ্মীর উপত্যকা দৈর্ঘ্যে ৮৪ মাইল আর প্রস্থে ২৫ মাইল। সমুদ্র সমতল থেকে ৫০০০ হাজার ফিট উঁচু। অধিবাসীরা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কিন্তু ভাষা প্রায় এক। প্রধানতঃ হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, শিখ ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এখানকার অধিবাসী। ১৯৪১ সালের আদম সুমারির রিপোর্টে জানা যায়, কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে ১৬,১৫,৪২৮ মুসলমান ৮৫,৬৩৮ হলো হিন্দু আর ২৭,০৩৪ হলো শিখ। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলী অধিবাসীদের বেশীর ভাগ থাকে লাডাকে। কাশ্মীরে শহর আছে ৩৯টি আর গ্রাম আছে ৮৯০৩।

প্রাগ্‌ঐতিহাসিক কাশ্মীর

জনশ্রুতি আছে যে একসময়ে সমস্ত কাশ্মীর উপত্যকায় স্থলের কোন চিহ্ন ছিলো না। ছিলো একটি বৃহৎ সরোবর। নাম ছিলো তার সতীসর। এই সতীসরে বাস করতো অসংখ্য পিশাচ, যক্ষ, নাগ আর তাদের রাজা ছিলো ভীষণ আকৃতির এক রাক্ষস নাম জলদেব। কেউ কেউ বলে জলধর। জলদেবই হোক আর জলধরই হোক এই ভীষণ দানবটির অত্যাচারে কারুরই এর সীমানায় প্রবেশাধিকার ছিলো না।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পুত্র ঋষি মারিচি—মারিচির পুত্র প্রজাপতি কাশ্যপ। কাশ্যপ বহুদিন একমনে তপস্যা করলেন। জলদেবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তাঁর এই সাধনা। অবশেষে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে একটি ময়না পাখীর বেশ ধরে সতীসরে এসে হাজির হলেন। ময়না পাখীটির ঠোঁটে ছিলো একখানি পাথর। ঠিক টিপ করে সজোরে পাথর খানা এসে পড়লো জলদেবের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে জলদেবের ভবলীলা হলো সাঙ্গ আর সতীসরের সমস্ত জল একটি নালা দিয়ে বেরিয়ে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পড়লো ছড়িয়ে। সতীসর আর সরোবর রইলোনা। সেইস্থানে গড়ে উঠলো উর্ব্বরা এক উপত্যকা। ময়নার মুখে আনা পাথর খানাই এখনকার হরি পর্ব্বত। আর উপত্যকার নাম রাখা হলো কাশ্যপামর—তাই থেকে কাশ্মীর। রূপকথাটি কাশ্মীরীদের মুখে বেশ ভালো শোনালেও এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে বের করবার চেষ্টা করা হয়নি। মনে হয় কাশ—অর্থে 'নালা' আর মীর—অর্থে 'পাহাড়'—এই দুই মিলে নাম হয়েছে কাশ্মীর।

রাজতরঙ্গিণী ও কহ্লাণ

কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা হর্ষের রাজত্ব কাল ছিলো ১০৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১০১ খ্রীষ্টাব্দ। চম্পক নামে তাঁর একজন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন। মহাকবি কহ্লাণ তাঁরই পুত্র। উচ্চ বংশে জন্ম লাভ করে কহ্লাণ লেখাপড়া শেখবার সুবিধা পেয়েছিলেন খুবই। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কর্ম্মে শৈব, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন। কাশ্মীরের প্রাচীন নির্ভর যোগ্য একমাত্র ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী কাব্য তাঁরই রচনা। ১১৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজ-তরঙ্গিণী লেখা সুরু করেন, এক বৎসরে শেষ করেন সেই মহাকাব্য। তিনি বলেছেন তাঁর কাহিনীর মূল বিষয়-বস্তু কাল্পনিক নয়—নানাভাবে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রাচীন মুদ্রা, পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা লেখা, প্রাচীন পুঁথিপত্র হলো তাঁর রচনার সহায়। কাজে কাজেই কাব্যের অতিরঞ্জনটুকু বাদ দিয়েই আমরা সাল তারিখ আর প্রাচীন রাজাদের কীর্ত্তি কাহিনীর মূল তথ্য টুকুর জন্য রাজতরঙ্গিণীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি। আর মহাকবি কহ্লাণকে জানতে হলেও রাজতরঙ্গিণী ছাড়া গতি নেই।

দ্বাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা জয় মিহিরের রাজত্বকালে কহ্লাণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর রচনা পৃথিবীর ঐতিহাসিকদের কাছে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকবে চিরকালের জন্য।

সম্রাট আকবরের সময় রাজতরঙ্গিণী পারস্য ভাষায় অনুবাদ করা হলো। আর একজন বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক ঐ মহাকাব্য ইংরাজীতে অনুবাদ করলেন ১৯০৪ সালে।

মহাভারতীয় যুগের কাশ্মীর

যীশুখৃষ্টের জন্মের দু' হাজার বছর আগে সর্ব্বপ্রথম কাশ্মীরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলো। রাজা দয়াকরণ খৃঃ পূঃ ২১৮০ অব্দে (?) এখানে হিন্দু শাসনের ভিত্তি স্থাপন করলেন। দু'শো তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন রাজা দয়াকরণের বংশধরেরা। রাজা সোমদত্তই বোধ হয় এই বংশের শেষ রাজা।

কাশ্মীরের যে রাজার গৌরবময় কাহিনী নিয়ে কহ্লাণ তাঁর রাজতরঙ্গিণীর প্রথম শ্লোক রচনা করেছেন তিনি হচ্ছেন রাজা প্রথম গোনন্দ। খৃঃ পূ ৩১২১ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। কহ্লাণের মতে তাঁর রাজত্ব কাল সুরু হয় খৃঃ পূঃ ২৪৪৮ সালে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রফেসর উইলসন বলেন প্রথম গোনন্দ সিংহাসন লাভ করেন খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে খৃঃ পূঃ ১৭১০ অব্দে। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মহাভারতের যুগের সমসাময়িক।

মহাভারতে যে রাজা জরাসন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়, কাশ্মীরের শাসন কর্ত্তা প্রথম গোনন্দ ছিলেন তাঁর নিকট আত্মীয়। রাজা জরাসন্ধের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ বাঁধলো—প্রথম গোনন্দ সৈন্য নিয়ে তাঁর সাহায্যের জন্য যাত্রা করলেন। কিন্তু মথুরার কাছে তিনি গুপ্ত-ঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন।

প্রথম গোনন্দের পুত্র দামোদ্র পিতৃহত্যার প্রতিশোধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করবার সংকল্প করলেন আর সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। শীঘ্রই সুযোগ মিললো। রাজা গান্ধার ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত। তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য স্বয়ংবর সভা ডাকা হলো। দামোদ্র দেখলেন এই সুযোগ। তিনি স্বয়ংবর সভায় যাত্রা করলেন। শেষ পর্য্যন্ত সেখানেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে হলো তাঁর যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হলেন।

(চল্‌বে)

০০ঃ একটুখানি ভাবো ঃ০০

(১) সামান্য বাতাসেই কেঁপে ওঠে, কিন্তু কয়েক টন ভার অনায়াসেই বইতে পারে —কে সে?

(২) কোন জিনিষটি সব সময়ে ওপরের দিকেই ওঠে—কখনও নীচের দিকে নামে না?

[উত্তর শেষ পাতায়

ধনপতি-উপাখ্যান

['চণ্ডীমংগল' অবলম্বনে]

শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার সেনগুপ্ত

[**পূর্বকথা** ঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল ধর্ম ; ধর্মকেন্দ্রিক সেই বাংলা সাহিত্যের যে কাব্যগুলির উদ্ভব হ'য়েছিল—তা' 'মংগল-কাব্য' নামে পরিচিত। সে সময়ের বাংলার পল্লীবাসী নর-নারীর সহজ এবং স্বভাব-সরল জীবনে এই কাব্যগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এই কাব্যশ্রেণীর মধ্যে আদর্শ ছিল,—ন্যায়-নীতি, যা আনন্দের মধ্য দিয়ে নর-নারীর জীবনকে 'সুন্দর'রূপে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারতো—পারতো চরিত্রকে দৃঢ় ক'রে তুলতে। এ-ছাড়াও 'মংগলকাব্য' গুলোর আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল—পার্থিব মানব-মানবীর মধ্যে স্বর্গলোকের দেব-দেবীর মহিমা প্রচার। মনসা, চণ্ডী, ষষ্ঠী, ধর্মরাজ প্রভৃতি দেব-দেবীর লৌকিক মহিমা প্রচারার্থ সৃষ্ট এই "মংগল-কাব্য'গুলি 'মনসা-মংগল' 'চণ্ডী-মংগল' প্রভৃতি নামে পরিচিত। আজ ধনপতি সদাগরের যে কাহিনীটি তোমাদের শোনাব—তা' 'চণ্ডী-মংগল' কাব্যের অন্তর্গত, এ কাহিনীটি শুনে স্পষ্টই বুঝতে পারবে যে, চণ্ডীদেবীর মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্য এর পিছনে কতোখানি।]

এক

কতোদিন আগে তা কে জানে উজানী নগরে ছিল এক ধনী সদাগর—নাম তার ধনপতি। তাঁর ছিল দুই স্ত্রী—বড় লহনা আর ছোটটি খুল্লনা। ধনপতির কোন ছেলেপুলে ছিল না—এ কারণে মনেও তাঁদের অশান্তির সীমা ছিল না। ধনপতি আর লহনার উপাস্য দেবতা ছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব। কিন্তু খুল্লনা আপনার অন্তরের নিষ্ঠা এবং ভক্তিরসধারার মাধুরী মিশায়ে চণ্ডীদেবীর পূজা ক'রতেন। এখানেই বাধল গণ্ডগোল। কারণ ধনপতি সদাগর চণ্ডীদেবীকে ঘৃণা ক'রতেন ঠিক সেই মত, চাঁদসদাগর যেমনি ঘৃণা ক'রতেন মনসাকে তাই তিনি কঠোর আদেশ দিয়েছিলেন—তাঁর বাড়ীতে চণ্ডীর নামও যেন উচ্চারিত না হয়।

একবার ধনপতি সিংহলে যাবেন চন্দন আনতে, তারই জন্য 'সপ্তডিঙ্গা' সাজান হচ্ছে—এ সংবাদ গিয়ে পেঁছিল অন্দর মহলের খুল্লনার কানে। তিনি ছিলেন খুব ধর্ম্মভীরু তক্ষুনি লুকিয়ে লুকিয়ে চণ্ডীদেবীর পূজো ক'রলেন তিনি তারপর ধনপতি বিদায় ক্ষণে

যখন তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন, তখন তিনি চণ্ডীর ঘট দেখিয়ে ধনপতিকে একটিবার দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে কাতর অনুরোধ ক'রলেন। জ্ব'লে উঠল ধনপতির ক্রোধ, পদাঘাতে ঘট ভেঙ্গে দিয়ে বাণিজ্যে বেরুলেন তিনি। সে দৃশ্য দেখে খুল্লনার ভীরু অন্তর কাঁপতে লাগল। মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগলেন আর দেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, তিনি যেন তাঁর স্বামীর কোন অকল্যাণ না ক'রেন যেন ক্ষমা করেন ক্ষমাসুন্দর চক্ষে।

দুই

....সিংহল দ্বীপ। তারই কাছে কালীদহ। সেই কালীদহ থেকে কিছু দূরে ভেসে চ'লেছে ও কার ডিঙ্গা? সেই সুসজ্জিত ডিঙ্গায় ব'সে একজন সমানে ভেবে চ'লেছেন। চণ্ডী! চণ্ডীর ক্ষমতা!! কই সে কি করতে পারল আমার? যার ঘট ভেঙ্গে দিলুম লাথি মেরে, সিংহল তো আর একটু মাত্র পথ। কতোক্ষণ লাগবে সেখানে পৌঁছোতে —চণ্ডী ক'রবে আমার ক্ষতি!!! ভেবে চলেন আর হাসেন গর্বের হাসি। বুঝতেই পারছো যে ইনিই ধনপতি। সে দম্ভভরা হাসি অলক্ষ্যে থেকে দেখে চণ্ডীদেবীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। খুল্লনার ভক্তি আর কাতর প্রার্থনাই এতক্ষণ ঠেকিয়ে রেখেছিল ধনপতির সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি। কিন্তু এতো বড় দম্ভ দেবা আর পারলেন না সহ্য ক'রতে। দেখতে দেখতে শান্ত সাগরের বুক ফুলে ফুলে উঠল·· ·· ঝড় এলো অতর্কিতে। সেই ভীষণ দৈত্যের মতো যে ঝড় এলো ধনপতির ছ'খানি 'ডিঙ্গাকে' ডুবিয়ে দিয়ে চোখের নিমেষেই আবার মিলিয়ে গেল। কিছু পূর্ব্বের সেই উত্তুঙ্গ ঊর্ম্মিমালা কোথায় যেন গেল মিলিয়ে। শুধু রক্ষা পেল সদাগর যে ডিঙ্গায় ছিলেন সেখানি। কোনমতে ঐ তরীখানি ধনপতিকে নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চ'লেছে। অদূরে কালীদহ, হঠাৎ ধনপতির দৃষ্টি-পথে উদিত হ'ল অপরূপ দৃশ্য। কালীদহের এক কমল বনে অজস্র পদ্মের মাঝে একটি বিরাট পদ্মের ওপর ব'সে আছেন অপূর্ব্ব সুন্দরী এক দেবীমূর্ত্তি। ধনপতির বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে গেল.....দেখলেন, সেই দেবীমূর্ত্তি হাতে তুলে একটি হাতী গিলে ফেলছেন আবার পর মুহূর্ত্তেই তা' উগড়ে ফেলছেন। সিংহলে পেঁাছেই ধনপতি রাজাকে সেই অপরূপ দৃশ্যের কথা ব'ললেন। রাজা আর সভাসদেরা সে কথাকে হেসেই উড়িয়ে দিল। ধনপতি উত্তেজিত হ'য়ে রাজা শালীবাহনকে ব'ললেন: বেশ, চলুন আপনি আমার সংগে, আমি আপনাকে দেখাবই সে দৃশ্য।

ঃ তবে এই সর্ত্তে, যদি আপনি ঐ দৃশ্য দেখাতে পারেন ·· অর্দ্ধেক রাজ্য দেব। আর যদি না পারেন—চিরজীবনের জন্য আমার কারাগারে বন্দী দশায় কাল কাটাতে হবে। বল্লেন রাজা। ধনপতি সে সর্ত্তে রাজী হ'য়ে রাজাকে নিয়ে গেলেন নির্দ্দিষ্ট স্থানে। কিন্তু কোথায় কমল-বনের সেই দৃশ্য? ধনপতি তো দেখতেই পাচ্ছেন না সে দৃশ্য। রাজার আদেশানুযায়ী ধনপতি বন্দী হ'লেন কারাগারে।

তিন

ঃ ঃ ঃ ঃ দিন গেল কতো ·· মাসের পর মাস কাটল ·· তারপর বছরের পর বছরও গেল কেটে। ধনপতি বন্দী হ'য়ে আছেন শালীবাহনের কারাগারে ·· এদিকে ধনপতির গত বছরের অনুপস্থিতিতে উজানী নগরে নেমেছে শোকের গভীর ছায়া ·· কেন ফেরেন না এতদিনেও! খুল্লনা রোজ দেবী চণ্ডীর কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়ঃ 'এখনও কেন ফিরছেন না তিনি? তাঁকে ফিরিয়ে এনে দাও মা।' ধনপতি সিংহলে যাবার কিছুদিন পরে খুল্লনার একটি ছেলে হয় ·· এত বছরের ব্যবধানে সে আজ বেশ বড় হ'য়েছে—নাম তার শ্রীমন্ত। একদিন সে শুধায় তার মা-কেঃ মা, তুমি সব ব্যবস্থা ক'রে দাও—আমি সিংহলে গিয়ে বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবোই আসব'। প্রথমে রাজী হয় না খুল্লনা কিন্তু শেষে মত দিলেন। যাবার আগে শ্রীমন্তকে ব'ললেন চণ্ডীর ঘটের সামনে প্রণাম ক'রতে। শ্রীমন্ত ক'রল সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। আর ব'লে দিলেনঃ কোন বিপদ এলে মা চণ্ডীকে স্মরণ ক'রো বাবা।' শ্রীমন্ত মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে রওয়ানা হ'ল। কালীদহের পথে আবার উঠল তেমনি ঝড় ·· শ্রীমন্ত দেবীকে স্মরণ ক'রল ·· শান্ত হ'য়ে গেল ঝড় ·· তারপরে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় পেঁাছে শ্রীমন্তও দেখতে পেল সেই দেবীমূর্ত্তি যা ধনপতি দেখেছিলেন। সিংহলে পেঁাছে রাজার কাছে সে জানতে পারল যে তার বাবা ধনপতি তাঁরই কারাগারে বন্দী ·· কমল বনের অবিশ্বাস্য দেবীমূর্ত্তি দেখাতে পারেন নি ব'লে। শ্রীমন্ত বলেঃ চলুন আমার সংগে, আমি আসবার সময় দেখে এসেছি সে দৃশ্য। এবারেও সর্ত্ত হ'ল—যদি শ্রীমন্ত দেখাতে পারে তবে সে পাবে অর্দ্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা। না দেখাতে পারলে পরের দিনই সকালে তার শিরশ্ছেদ করা হবে। সেই সর্ত্তে রাজী হ'য়ে শ্রীমন্ত রাজাকে নিয়ে গেল—কিন্তু দেখাতে পারল না। সে দৃশ্য তখন অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

পরের দিন।

জল্লাদের সামনে শির অবনত ক'রে দিয়েছে শ্রীমন্ত ঃএক্ষুনি জল্লাদের শাণিত অস্ত্রের

আঘাতে তার দেহ থেকে শির আলাদা হ'য়ে যাবে। শ্রীমন্ত স্মরণ করে চণ্ডীদেবীকে। কাতরোক্তি জানায় তিনি যেন তার বাবাকে ফিরিয়ে দেন উজানী নগরে। চণ্ডী ট'ললেন। মায়ার ডাকিনী-যোগিনী পাঠিয়ে রক্ষা ক'রলেন শ্রীমন্তকে। ডাকিনী-যোগিনীদের 'উত্তম-মধ্যমের' ঠেলায় জল্লাদ ও তার অনুচরেরা 'ত্রাহি', 'ত্রাহি' ডাক ছেড়ে পালিয়ে গেল। চণ্ডী রাজাকেও স্বপ্নাদেশে জানালেন সব কথা∘∘ব'ললেন: শালিবাহন, তোর মেয়ের সাথে শ্রীমন্তের বিয়ে দে। তাঁর আজ্ঞা শুনে পরের দিনই শালীবাহন নিজের মেয়ের সংগে শ্রীমন্তের বিয়ে দিলেন। শ্রীমন্তের অনুরোধে ধনপতিকেও মুক্তি দিলেন। পুত্র-পুত্রবধূসহ ধনপতির ডিঙ্গা আবার ভাসল উজানী নগরের দিকে............

যথাকালে ধনপতি উজানী নগরে উপস্থিত হ'লেন। বিমর্ষ উজানী-নগর আবার আনন্দোজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। ধনপতি দেবী চণ্ডীর ঘটের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'রে জানালেন: 'মা, বড় অপরাধ ক'রেছি এতদিন। আমায় ক্ষমা কর মা। আজ থেকে আমি তোমারও একনিষ্ঠ সেবক হ'লেম।'

[৩৭৮ পৃষ্ঠার পর]

বলতো এবং তা' থেকে ইয়োরোপীয়রা করল্ 'পিল্পে'। আর সেইজন্যই বোধকরি সারা ইয়োরোপে পঞ্চতন্ত্র পিল্পের গল্প (পিল্পেস্ ফেবল্) নামে অভিহিত হয়ে রইল।

পঞ্চতন্ত্রের অমূল্য উপদেশগুলি তখন থেকেই সারা ইয়োরোপের মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতের এ হেন দুর্লভ গ্রন্থের প্রতি হলেন তাঁরা তখন অনুরক্ত—এর অপূর্ব উপদেশগুলি করলো তাদের উন্মুখ, অনুসন্ধিৎসু। এর পর 'অসিনাস' নামে এক রোমাণ পণ্ডিতের দুরূহ প্রচেষ্টায় পঞ্চতন্ত্র অনূদিত হয় গ্রীক থেকে লাতিনে। পঞ্চতন্ত্রের তখন 'সুবর্ণ যুগ' বলা যেতে পারে কারণ ভারতীয় মণীষা তখন অপরূপ হয়ে উঠেছে পৃথিবীর প্রায় শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির মাধ্যমে। ১২৫০ খ্রীঃ র‍্যাবীযোয়াস নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত করেন এর হিব্রু অনুবাদ, এবং এই শতাব্দীতেই পঞ্চতন্ত্রের স্পেনীয় অনুবাদও হয়। তার কিছুদিন পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পঞ্চতন্ত্রের জার্মান অনুবাদ প্রকাশ হয়। আজ পঞ্চতন্ত্র বিশ্ববিখ্যাত। পৃথিবীর প্রায় সব কয়টি শ্রেষ্ঠ ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশ হয়ে পৃথিবীর সকলেরই স্বীকৃতি পেয়েছে। এই গল্পগুলি হিমাচলে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশা করা যায় এগুলি তোমাদের কাছে ভাল লাগবে।

ইছামতীর চরে

সুনির্ম্মল নায়ক

ঢল্‌ঢলে ঐ ঢেউ খেলান, ইছামতীর জলে—
পালটি তুলে নৌকাগুলি দুলে দুলে চলে,
দুই পারে তার শ্যামল শোভা দোলে জলের 'পর,
বাতাস আসি কাশের বনে দোলায় যে চামর,
নাম না জানা কত ফুলের শোভা মনোহর,
কোথাও বা তার ঘাসে ঢাকা সবুজ রংয়ের চর,—
সেইখানেতে চরায় গরু যত রাখাল ছেলে,
দুপুরবেলা গাছের তলে দল বেঁধে সব খেলে।
শাখে শাখে কতই পাখী ডাক্‌ছে কত সুরে,
এক পায়েতে দাঁড়িয়ে সারস রয় যে গো ঐ দূরে।
বাবলা গাছে মাছরাঙাটি ভাবনা কিসের করে,
শিকার বুঝি পায়নিকো আজ ইছামতীর চরে
সারি সারি ডিঙ্গি বেয়ে আস্‌ছে কত জেলে
খালুই ভরা ধরবে যে মাছ খ্যাপলা জাল ফেলে,
মাথার 'পরে উড়বে এসে গাঙশালিকের দল—
কেমন করে মাছটি নেবে খুঁজবে তারই ছল,
বিহান্ বেলা গ্রামের বধূ ঘোম্‌টা মাথায় দিয়ে,
দল বেঁধে সব আসবে ঘাটে কলসী কাঁখে নিয়ে,
ব'সে সেথা সবাই তারা কইবে কত কথা,
সারাদিনের সুখ-শান্তি যত মনের ব্যথা,
নিঝুম্ রাতে চাঁদের কিরণ ভাসিয়ে দিল চর,
তারা সকল ঝিল্‌মিলিয়ে নাচল নদীর পর।
থাক্‌তো যদি ছোট্ট কুটির ইছামতীর চরে
ওদের মতো থাকতেম সেথা সারাজীবন ধরে।

০০:::::০০

হাসবে?

(নতুন গল্প)

সম্পাদক। (লেখকের প্রতি) নতুন গল্প এনেছেন তো?

লেখক। আজ্ঞে হাঁ, দয়া করে শুনুন তাহলে--সে অনেক দিনের কথা একদেশে ছিলেন এক সৌখীন ভদ্রলোক। তাঁর ছিল বাগানের সখ। নিজে হাতে তিনি গাছ পুঁততেন, গাছে জল দিতেন, গাছের গোড়া খুঁড়তেন—

স। হয়েছে, হয়েছে, তারপর কি হলো সংক্ষেপে বলুন—

লে। তারপর একদিন তাঁর সখের একটি গাছ তার ছেলে কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেলল। ছেলেটিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, কে গাছ কেটেছে তখন সে বাপের অগ্নি চক্ষুর সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ালো—

স। থাক্ থাক্, ওগল্প সবাই জানে। ঘটনাটা ঘটেছিলো আমেরিকায়--ওটা ছিলো একটি চেরী গাছ, তাই না?

লে। আজ্ঞে না!

স। ছেলেটির নাম জর্জ্জ ওয়াশিংটন—?

লে। আজ্ঞে না।

স। ঐ সত্যবাদী ছেলেটি তো আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন—?

লে। আজ্ঞে তাও নয়--ছেলেটির নাম ভূতো। কালীপূজোর তুবড়ী করবার জন্য যে গাছটি কেটেছিল সেটা ছিল একটি কুলগাছ। আর তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, সে তখন বললে, বেশ করেছি। নইলে নতুন গল্প হয় কি করে বলুন--আর এই সব গল্পইতো চলছে আজকাল।

(আর্টিষ্ট)

শিক্ষক। সুশীল, তুমি সব বানানে দীর্ঘ ই দিয়েছ কেন?

সুশীল। আজ্ঞে দীর্ঘ ইটা মানায় ভাল। দেখুন ভাল করে মনে হবে যেন ছবি এঁকে রেখেছি।

খেলা ধুলার কথা

অলিম্পিকের তোড়জোর

শ্রীসুনীল বসু

আসন্ন বিশ্ব অলিম্পিকের যে স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে তাতে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বাণী সন্নিবেশিত করা হবে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু যে বাণী প্রেরণ করেছেন তার সারমর্ম্ম হলো :

অলিম্পিকের খেলাধূলার অনুষ্ঠানের কথা শুনলেই আমাদের মনে প্রাচীন গ্রীস দেশের একখানা ছবি ভেসে ওঠে। গ্রীসের সেই গৌরবময় দিনগুলির পর পৃথিবীর অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, আমরাও সভ্যতার অনেক স্তর উঁচুতে উঠে গেছি।

প্রাচীন কালে গ্রীসে যে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের আসর বসতো তাতে সব দেশেরই লোকজন মিলিত হয়ে খেলাধূলার মাধ্যমে আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হতো। শত্রুমিত্র ভেদাভেদ তখন তারা সাময়িকভাবে ভুলে যেতো। এখন অলিম্পিকে যোগদানকারী সকল দেশের বাছাই খেলোয়াড়েরা বিজয়ীর সম্মান লাভ করবার জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতায় মেতে উঠবেন তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু সকলেই খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব নিয়ে মৈত্রীপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলেন—এটাই তিনি আশা করেন।

অলিম্পিকে যোগদান করবার জন্য ভারতবর্ষ থেকেও একদল প্রতিনিধি মেলবোর্ণে যাচ্ছেন, তাঁরা যেন ঐ কথাই মনে রাখেন। আর অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের যে মৈত্রীভাব বজায় আছে, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় সেই সম্পর্ক বজায় রেখে তাঁরা যেন জাতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। পণ্ডিত নেহেরুর এই বাণী অলিম্পিকের উদ্দেশ্য-মন্ত্রেরই প্রতিচ্ছবি।

দেশভেদে তোড়জোড়—ইটালীর অলিম্পিক কমিটি তাদের দেশের খেলোয়াড়দের অলিম্পিক সফরের জন্য ১লক্ষ ৯৫হাজার পাউণ্ড ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ১৩৭ জন খেলোয়াড় এই দেশ থেকে অংশগ্রহণ করছেন। সাইকেলে এই দেশ সাফল্যের আশা রাখে।

ফ্রান্স থেকে যাচ্ছেন ১২৮ জন ক্রীড়াবিদ্, তাছাড়া ট্রেনার, ম্যানেজার, ডাক্তার, তত্বিরকারী আছেন। সকলে মিলে দলটিতে রয়েছেন ১৭৫ জন।

দক্ষিণ আফ্রিকার দলটিতে আছে ৫১ জন প্রতিযোগী আর ৭ জন কর্মকর্তা। ১৯৫৪ সালে কমনওয়েলথ আর বৃটিশ এম্পায়ারের খেলোয়াড়দের মধ্যে যে ক্রীড়া প্রতিযোগীতার অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে এই দেশ কয়েকটি স্বর্ণপদকের অধিকারী হয়েছিল।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম জার্ম্মানী সম্মিলিতভাবে অলিম্পিকে পাঠাচ্ছে ১৬৯ জন প্রতিযোগী। তিরিশজন অধিনায়কের নেতৃত্বে ছয় ভাগে বিভক্ত হয়ে এই দলটি যাত্রা করছে মেলবোর্ণের দিকে।

প্রজাতন্ত্র চীন থেকে চলেছেন ৪৫ জন প্রতিযোগী। বাস্কেটবল, হাই জাম্প, লংজাম্প, ভার-উত্তোলন, মুষ্টিযুদ্ধ আর রাইফেল চালানোর বাজীতে এঁরা সাফল্য আশা করেন।

সিঙ্গাপুর থেকে তৈরী হয়েছেন ৫৪ জন প্রতিযোগী। হকি, বাস্কেটবল, ওয়াটারপোলো, ভার-তোলা প্রভৃতি বাজীতে এঁরা প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন।

জামাইকার বিশ্ববিখ্যাত দৌড়বীর জি, রডেন এবারও চারশো মিটার দৌড়ে অংশগ্রহণ করবেন। ইনি হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে এই দূরত্বের বিজয়ী। তাঁরই কৃতিত্বের জন্য সেবারে চারশো মিটার রিলে রেসে জামাইকা বিশ্ব রেকর্ড করেছিল।

এবারের অলিম্পিকে হাঙ্গেরীর প্রতিযোগীদের সংখ্যা হচ্ছে ১০৬। এদের মধ্যে ৪ জন বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী রয়েছেন। দূরপাল্লার দৌড়বীর ইহারোজ, রসসাভলকী, রেজেন্থ আর সাঁতারু ইভা জেকেলী প্রভতি বিজয়ী বীরের দল হাঙ্গেরীকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে আশা করা যায়।

সিংহল মুষ্টিযুদ্ধে সাফল্য আশা করে। সি, পি জয়সূর্য্য ও এইচ, পি জয়সূর্য্য দুই সহোদরের উপরই সিংহল আশা রাখে।

ফুটবলে ভারতীয় বীরের দল—এবারের অলিম্পিকে ফুটবলে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবার জন্য যে দলটি মেলবোর্ণে যাত্রা করেছে তার সংখ্যা হলো ১৭। খেলোয়াড়দের বয়সের গড়পড়তা হলো তেইশ। সবচেয়ে বয়স কম হলো বলরামের। ইনি হচ্ছেন হায়দ্রাবাদের লেফট আউট। এখানে খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো :—

গোলরক্ষক ঃ থঙ্গরাজ—ইনি ষোল বছর বয়স থেকে ফুটবল খেলছেন। বর্ত্তমান বয়স ২১ বৎসর। গত দুই বৎসর ইনি জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগীতায় সার্ভিসেস দলের পক্ষে খেলে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

শঙ্কর নারায়ণ—ইনি বোম্বের খেলোয়াড়। বয়স ২১ বৎসর। এগার বছর বয়স থেকে ইনি ফুটবল খেলছেন। ইণ্টার-ভারসিটি ফুটবল প্রতিযোগীতায় ১৯৫৫ সালে ইনি বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গত দুই বৎসর জাতীয় প্রতিযোগীতায় ইনি বোম্বে ষ্টেটএর পক্ষে খেলে আসছেন।

ব্যাক ঃ টি, আবদুল রহমান—ইহার জন্মস্থান কালিকট, ইনি বাংলা দেশের পক্ষে খেলেন, বয়স বাইশ বছর। দশ বছর বয়স থেকে ইনি ফুটবল খেলছেন। গত দুই বৎসর বাংলার পক্ষে ইনি জাতীয় প্রতিযোগীতায় যোগদান করে আসছেক, গত বৎসর আফগানিস্থান সফরে ইনি ভারতের দলে ছিলেন আর চতুর্দ্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগীতায় বাংলার একজন নির্ভরশীল ব্যাক হিসাবে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন।

এস, খাজা আসিজুদ্দিন—ক্রীড়া জগতে ইনি আজিজ নামে পরিচিত। বয়স ২৫ বৎসর। ডানদিক, বাঁদিক—দুই দিকেই ইনি ব্যাকের পোজিসনে খেলতে পারেন। বারো বছর বয়স থেকে ইনি ফুটবল খেলছেন। ১৯৪৯ সাল থেকে এপর্য্যন্ত ইনি হায়দারাবাদ ষ্টেটের পক্ষে জাতীয় প্রতিযোগীতায় যোগদান করে আসছেন। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে তিনি ভারতীয় দলের পক্ষে ছিলেন। ১৯৫৫ সালে রাশিয়া সফরকারী ভারতীয় দলে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শেখ আবদুল লতিফ—ইনিও হায়দারাবাদের খেলোয়াড়। ডান, বাঁ দুদিকেই সমান যোগ্যতার সঙ্গে ব্যাকে খেলতে পারেন ইনি। বর্ত্তমান বয়স ২৩ বৎসর। বারো বছর বয়সে ইনি ফুটবল খেলা শুরু করেন। হায়দারাবাদের পক্ষে ১৯৫২ সাল থেকে এপর্য্যন্ত তিনি জাতীয় প্রতিযোগীতায় যোগদান করে আসছেন। ১৯৫৪ ও '৫৫ সালে ইনি চতুর্দ্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগীতায় ভারতের পক্ষে যোগদান করেন।

এম, কাম্পাইয়া—ইনি বাংলার খেলোয়াড়, বয়স ২৪ বৎসর। নয় বৎসর বয়স থেকে ইনি ফুটবল খেলছেন। রাইট হাফ এবং লেফ্‌ট হাফ দু'দিকেই সমান খেলেন ইনি। হকি, ভলিবল আর ব্যাডমিন্টনেও ইনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৫৪ ও '৫৫ সালে মহীশূরের পক্ষে আর ১৯৫৬ সালে বাংলার পক্ষে জাতীয় প্রতিযোগীতায় যোগদান করেছেন। ১৯৫৫ সালে চতুর্দ্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগীতায় ইনি ভারতের পক্ষে যোগদান করেন।

মহম্মদ আবদাস সালাম—ইনি বাংলার খেলোয়াড়, সালাম নামে পরিচিত। বর্ত্তমান বয়স ২৫ বৎসর। যখন আট বছর বয়সের কিশোর বালক তখন থেকেই ফুটবল খেলছেন ইনি। মাঝখানের যে কোন পোজিসনে ইনি দক্ষতার সঙ্গে খেলতে পারেন। ১৯৫২ সাল থেকে পর পর তিন বছর তিনি হায়দারাবাদের পক্ষে জাতীয় প্রতিযোগীতায় যোগদান করেছেন, এ বছরে খেলছেন বাংলার পক্ষে।

নিখিল নন্দী—ইনিও বাংলার খেলোয়াড়। বর্ত্তমান বয়স ২৩ বৎসর। লেফ্‌ট হাফ্‌ ও সেন্টার ফরওয়ার্ড দুই পোজিসনেই ইনি যোগ্যতার সঙ্গে খেলতে পারেন। বাংলার পক্ষে জাতীয় প্রতিযোগীতায় ইনি ১৯৫৩, '৫৫ ও '৫৬ সালে যোগদান করেন আর চতুর্দ্দলীয় প্রতিযোগীতায় ভারতের পক্ষে খেলেছেন ১৯৫৫ সালে।

আমেদ হুসেন—ইনি হায়দারাবাদের খেলোয়াড়। বর্ত্তমান বয়স ২৬ বৎসর। হাফ ব্যাকের পোজিসনেই খেলেন ভাল। জাতীয় প্রতিযোগীতায় ইনি হায়দারাবাদের পক্ষে ১৯৫২, '৫৩, '৫৪ ও '৫৬ সালে খেলেছেন। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় দলের আফগানিস্থান সফরে তিনি ভারতীয় দলভুক্ত ছিলেন।

নুর মহম্মদ—ইনি হায়দারাবাদের কৃতীমান খেলোয়াড়। একটানা তের বৎসর ইনি হায়দারাবাদের পক্ষে জাতীয় প্রতিযোগীতায় যোগদান করে আসছেন। লেফ্‌ট হাফ্‌ ও লেফ্‌ট ব্যাক দুই পোজিসনেই ইনি ভাল খেলেন। ১৯৫১ সালে দূর প্রাচ্য সফরে ইনি ভারতীয় দলের পক্ষে যোগদান করেছিলেন। ভারতের পক্ষে ইনিও হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া ভারতের পক্ষে ইনি সমস্ত প্রতিযোগীতায় যোগদান করেছেন।

প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি বাংলার খেলোয়াড় আর ব্যানার্জ্জী নামে পরিচিত। বর্ত্তমান বয়স ২০ বৎসর। ১৯৫৩, ৫৪ সালে ইনি বিহারের পক্ষে জাতীয় প্রতিযোগীতায় যোগ দিয়েছিলে আর গত দু'বছর খেলছেন বাংলার দলে। চতুর্দ্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগীতায় ইনি ১৯৫৫ সালে ভারতীয় দলভুক্ত ছিলেন।

সমর ব্যানার্জ্জী—কলকাতার খেলার মাঠে যিনি বদ্‌রু নামে সুপরিচিত তিনিই হচ্ছেন সমর ব্যানার্জ্জী। বাংলা দলে ইনি জাতীয় প্রতিযোগীতায় যোগদান করে আসছেন ১৯৫৩ সাল থেকে। ১৯৫৪ সালের চতুর্দ্দলীয় প্রতিযোগীতায় তিনি ভারতীয় দলে ছিলেন। ইঁহার বয়স ২৩ বৎসর।

কৃষ্ণ চন্দ্র পাল—ইনিও বাংলার খেলোয়াড়, কেষ্ট পাল নামে পরিচিত। বাংলার একজন কৃতীমান সেণ্টার ফরওয়ার্ড ইনি। বয়স ২৪ বৎসর। কখন কখন রাইট আউটেও খেলে থাকেন ইনি। দলের আক্রমণ ভাগে ইনি বেশ দক্ষতার সঙ্গে নেতার স্থান গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ ও ১৯৫৬ সালে ইনি জাতীয় প্রতিযোগীতায় বাংলার পক্ষে খেলেছিলেন।

কৃষ্ণস্বামী কিট্টু—ইনিও বাংলার একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়। এবারের অলিম্পিক দলটির ইনি ভাইস্‌-ক্যাপ্টেন। বয়স ২৪ বৎসর। ১৯৫১, ১৯৫২ ও '৫৪ সালে ইনি মাদ্রাজের পক্ষে জাতীয় প্রতিযোগীতায় যোগদান করেন। ১৯৫৫ ও '৫৬ সালে বাংলার পক্ষে খেলেছেন। ১৯৫২ ভারতের অষ্ট্রিয়া সফরে ইনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৪ ও '৫৫ সালে ইনি চতুর্দ্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগীতায় ভারতের পক্ষে যোগদান করেন। আসলে ইনি মাদ্রাজের অধিবাসী।

এম, কানাইয়ান—বাংলার খেলোয়াড়, ২৪ বৎসর বয়সের যুবক ইনি। রাইট আউট এবং লেফ্‌ট আউট পোজিসনে ইনি সমান দক্ষতার সঙ্গে খেলতে পারেন। ১৯৫২ সাল থেকে ইনি বাংলার পক্ষে জাতীয় প্রতিযোগীতায় খেলে আসছেন। ভারতের পক্ষে দুবার খেলেছেন ১৯৫৫ সালে চতুর্দ্দলীয় প্রতিযোগিতায় আর ভারতের রাশিয়া সফরের সময়।

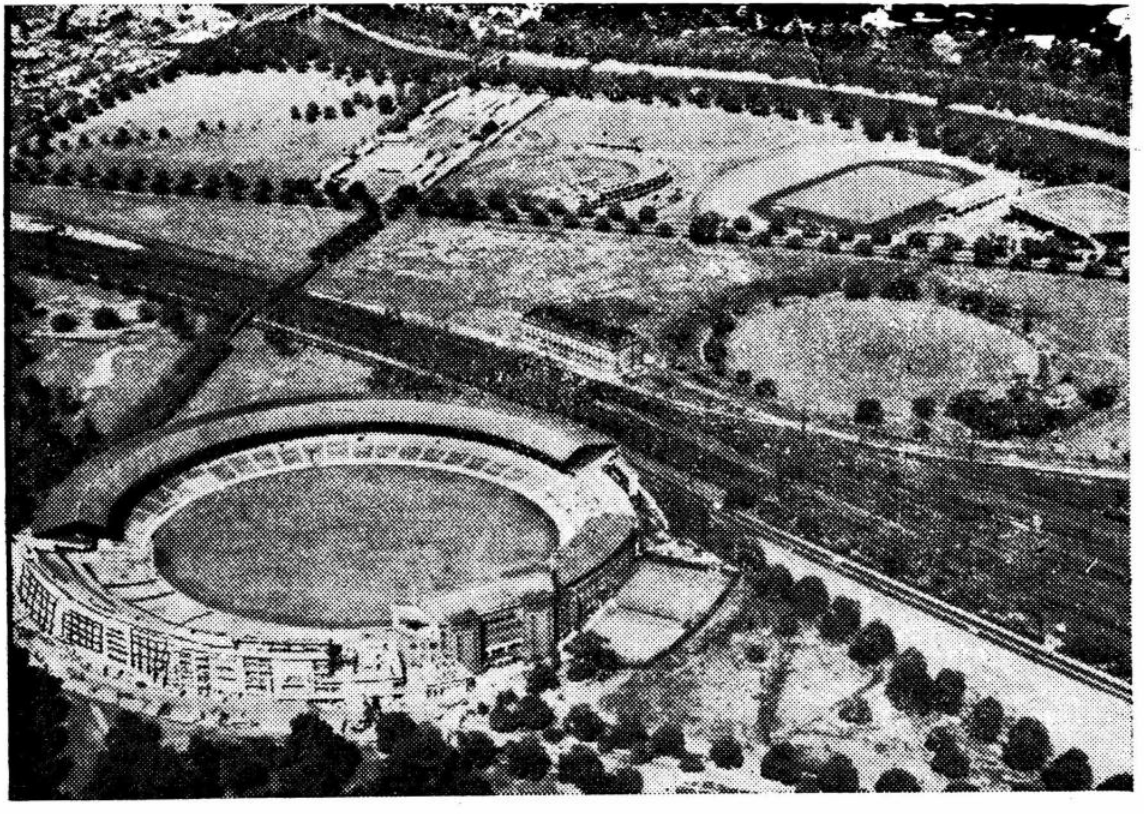

এ বছরে এখানেই হচ্ছে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা। অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ ক্রিকেট মাঠ নীচের দিকে দেখা যাচ্ছে। ওটাকেই মূল ষ্টেডিয়াম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

নেভিল ষ্টিফেন জোশেফ্ ডি সৌজা—ইনি বোম্বের খেলোয়াড়, বয়স ২৪ বৎসর। ইনসাইড রাইট আর সেণ্টার ফরওয়ার্ডে ইনি বেশ ভালই খেলতে পারেন। হকিতেও এঁর সমান দক্ষতা আছে। জাতীয় প্রতিযোগিতায় বোম্বের পক্ষে ১৯৫৩ থেকে খেলে আসছেন ইনি।

বলরাম—হায়দরাবাদের খেলোয়াড় ইনি। বয়স ১৯ বৎসর। ইনসাইড লেফট ও ইনসাইড রাইট উভয় পোজিসনেই খেলার দক্ষতা ইঁহার আছে। ১৯৫৫ ও ৫৬ সালে হায়দরাবাদের পক্ষে ইনি জাতীয় প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

মহম্মদ জুলফিকারুদ্দিন—হায়দারাবাদের খেলোয়াড়, ১০ বছরের যুবক। ইনসাইড রাইট ও ইনসাইড লেফট উভয় পোজিসনেই ইনি সমান ভাবে খেলতে অভ্যস্ত। ১৯৫৫ ও ৫৬ সালে ইনি হায়দারাবাদের পক্ষে জাতীয় প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছেন।

সরোজকুমার চ্যাটার্জ্জী—বাংলার একজন নির্ভরশীল গোলরক্ষক। বয়স ২৪ বৎসর। অলিম্পিকের বাড়তি গোলরক্ষক হিসাবে দলভুক্ত হয়েছেন। ১৯৫৬ সালে ইনি বাংলার পক্ষে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছেন।

সুশীলকুমার গুহ—বাংলা থেকে মনোনীত হয়েছেন। ব্যাকের পোজিসনে (দক্ষিণ) খেলার ওপর ইঁহার বেশ দক্ষতা আছে। ইনিও বাড়তি খেলোয়াড় হিসাবে দলভুক্ত হয়েছেন। ১৯৫৪ সাল থেকে ইনি চতুর্দ্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

সুন্দরলাল—ইনি মধ্যপ্রদেশের একজন কৃতীমান খেলোয়াড়। হাফের পোজিসনে ইনি দক্ষতার সঙ্গে খেলেন। বাড়তি খেলোয়াড় হিসাবে ইনিও মনোনীত হয়েছেন।

সুবিমল গোস্বামী—এঁকে আমরা চুনী গোস্বামী বলে জানি। ১৯ বছরের কিশোর ছাত্র ইনি। কলকাতার মাঠে গত নয় বৎসর ইনি বেশ সুনামের সঙ্গে ইনসাইড ফরওয়ার্ডে খেলে আসছেন। ইনিও বাড়তি খেলোয়াড় হিসাবে মনোনীত হয়েছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রাচ্য সফর—অষ্ট্রেলিয়ার ভারত সফরে প্রথম খেলা হলো পাকিস্থানের সঙ্গে করাচীতে। পাকিস্থান এই খেলাতে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। শক্তিশালী অষ্ট্রেলিয়ার দলকে ৯ উইকেটে দিল হারিয়ে। অবশ্য ম্যাটিং উইকেট পাকিস্থানকে সাহায্য করেছে খুবই। তার ওপর ফজল মামুদ আর খান মহম্মদের বলের তীব্রতা সহজেই কাবু করে দিয়েছিল অষ্ট্রেলিয়া দলকে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে রাণ হয়েছিল ৮০, পাকিস্থানের হলো ১৯৯। অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে হলো ১৮৭ আর পাকিস্থানের দ্বিতীয় ইনিংসে হলো এক উইকেটে ৬৯। পাকিস্থান ৯ উইকেটে বিজয়ী হলো।

প্রথম টেষ্ট—ভারতের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম টেষ্টে ভারতের শোচনীয়ভাবে পরাজয় ঘটলো। খেলাটি হয়েছিল মাদ্রাজে। ভারত প্রথম ইনিংসে রাণ তুললো ১৬১। তার জবাবে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে তুলে দিলো ৩১৯। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের হলো ১৭৭। কাজে কাজেই অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৫ রাণে বিজয়ী হলো।

দ্বিতীয় টেষ্ট—ভারতের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা হলো বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে। এই খেলাটি শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। প্রথম ইনিংসে দ্বিতীয় দলের রাণ হয় ২৫১। অষ্ট্রেলিয়া দল তার জবাবে ৭ উইকেটে ৫২৩ রাণ করে ডিক্লেয়ার করে দিল। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেটে ২৫০ রাণ করবার পরই সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কাজে কাজেই খেলা অমীমাংসিতভাবেই শেষ হয়ে গেল।

টেষ্ট খেলার আগে

কলকাতায় অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ সুরু হবার আগে দু'দলের অধিনায়ক আয়ান জনসন ও পলি উম্রিগড় টস করছেন। টসে ভারতেরই জয়লাভ হলো।

তৃতীয় টেষ্ট—অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতে তৃতীয় ও শেষ টেষ্ট খেলা হলো কলকাতায়। এই খেলাটিতে ভারতের ৯৮ রাণে পরাজয় ঘটলো। প্রথম ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়ার রাণ হলো ১৭৭। ভারতের হলো ১৩৬। দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়ার হলো ১৮৯ (ডিঃ)। ভারতের পক্ষে ১৩৬ রাণের বেশী তোলা সম্ভব হলো না দ্বিতীয় ইনিংসে। কাজে কাজেই এবারে ৯৪ রাণে পরাজয় হলো ভারতের, আর পাঁচদিনের খেলা চার দিনের মাথায় চা পানের সময়ের পঁচিশ মিনিট আগেই শেষ হয়ে গেল।

রোভার্স কাপ ফাইনাল—রোভার্স কাপের ফাইনাল খেলা হয়ে গেল। গত বছরের রাণার্স আপ মহমেডান স্পোর্টিং গত বারের বিজয়ী মোহনবাগানকে হারিয়ে দিল ৩-১ গোলে। গত বছরেও এই দুই দলই ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিলো, বলা বাহুল্য, এবারে হারজিতের চাকা ঠিক বিপরীত দিকে ঘুরলো। খেলার মাঠে ভাগ্যলক্ষ্মী কখন যে কোন দিকে হেলে পড়েন মানুষের বোধগম্যের সেটা বাইরে। তবে একথা জোর করে বলা যেতে পারে, বড় বড় প্রতিযোগিতায় কলকাতার দলেরই প্রাধান্যই বেশী দেখা যায়।

ইতিপূর্ব্বে ১৯৪০ সালে মহমেডান দল রোভার্স বিজয়ী হয়েছিল। তারপর ১৯৪১ সালে বিজয়ী হলো ইষ্টবেঙ্গল। সেই দুই বছরই ঐ দুই দলই রোভার্স জয় করে ট্রিপল ক্রাউন লাভের অধিকারী হয়েছিল। এবারে ডুরাণ্ড কাপ জয়লাভ করলে মোহনবাগানের ও ট্রিপল ক্রাউন লাভ হবে।

দিল্লীর ডি, সি, এম ফুটবল—প্রতিযোগিতায় ফাইনাল খেলার ও মীমাংসা হয়ে গেছে। ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ১ গোলে ইষ্টবেঙ্গলকে হারিয়ে এ বছরেও বিজয়ী হয়েছে। এখন শুধু বাকী রইল ডুরাণ্ড কাপের শেষ খেলাগুলি।

আফ্রিকার অন্তর্গত ইথিওপিয়া হাবসীদের রাজ্য। হাবসী রাজা হাইলে সেলাসী সম্প্রতি ভারতের অতিথি হয়েছিলেন। গত ৭ই নভেম্বর ভারতের নাগরিকদের পক্ষ থেকে দিল্লী মিউনিসিপাল কমিটি তাঁকে একটি হাতীর দাঁতের তৈরী ক্ষুদ্র জাহাজ উপহার দেন। ছবিতে রাজাকে উপহারটি গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। হাবসীরা খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ও স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী।

দি প্রিন্স এণ্ড দি পপার

(মার্ক টোয়েন লিখিত গল্পের মর্ম্মানুবাদ)

দুর্গাপদ তরফদার

[**পূর্ব্বাভাষ**—পাঁচশো বছর আগে লণ্ডনে এক ভিখারী পরিবারে একটি সুন্দর শিশুর জন্ম হলো। তার নাম টম্ ক্যান্টি। ছেলেটি দুঃখের বোঝা বাড়াতেই এলো। ঠিক সেই দিনে রাজবাড়ীতে বিখ্যাত টিউডর বংশে আর একটি রাজকুমারের জন্ম হলো। রাজকুমারের জন্ম সংবাদে সারা লণ্ডনে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। এদিকে টমের বাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বস্তীতে বাস করে ওরা। তার ওপর টমের বাবা আর ঠাকুমা ছিল অত্যন্ত কুচরিত্রের লোক। প্রায় ওরা টমের মাকে মারধোর করতো। টমের আর দুজন বড় বোন ছিল। তাদের নাম বেট ও নান। তাদের ও তাদের মায়ের স্বভাব কিন্তু ভাল ছিল। টমেদের বস্তীতে একজন পাদরী সাহেব বাস করতেন। তিনি অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ছিলেন, বস্তীর ছেলে-মেয়েদের তিনি লেখাপড়া শেখাতেন ও নানা ধরণের গল্প বলতেন। অবসর সময়ে টম্ পাদরী সাহেবের কাছে এই সব গল্প শুনতো। ক্রমশঃ তার মনে এলো বিরাট এক পরিবর্ত্তন। সব সময়ে সে ভাবতো সত্যিকারের রাজ-প্রাসাদের আর রাজপুত্তুরের কথা। একবার চাক্ষুষ এই সব দেখবার আশা ও পোষণ করতো মনে মনে। রাজ পুত্তুরের স্বপ্ন টমের মনের মধ্যে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে সে নিজেই রাজ পুত্তুরের চাল চলন অনুকরণ করতে আরম্ভ করলো। তার সঙ্গী সাথী নিয়ে নকল রাজ দরবার বসালো। তাদের এক একজনকে নকল উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীর পদে বহাল করল। পাড়া পড়সীদের ছোট খাটো তর্ক বিবাদের নিজেই বিচার করে দিতে আরম্ভ করলো। এতে ও টমের মন উঠল না। সত্যিকারের রাজ পুত্তুরকে দেখবার জন্য মন তার আকুল হলো। স্বপ্নেও তার রাজ-প্রাসাদ ও রাজ পরিবারের দৃশ্যগুলি চোখের সামনে ভাসতো। আর ঘুম ভেঙে গেলে যখন সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যেতো তখন তার মন বিষাদে ভরে যেতো। একদিন অন্যমনস্কভাবে পথে ঘুরতে ঘুরতে টম্ সত্যিকারের রাজবাড়ীর সামনে এসে হাজির হলো। তার বরাত ভালই ছিল, সত্যিকারের রাজকুমার ও তাকে ডেকে নিয়ে নিজের ঘরে বসিয়ে খুব খাতির করে নানাবিধ আলাপ আলোচনা করতে আরম্ভ করলেন।]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[যুবরাজের মনের কথা]

ও সব কথা যাক্ ; তোমার "ওফ্যাল কোর্টের সব কথা আমাকে ভাল করে বল দেখি। সেখানে খুব মজা করে নিশ্চয়ই তোমরা দিন কাটাও ?"

"আজ্ঞে সত্যি কথা বলতে কি—সেখানে ভারী মজা, ভারী আনন্দ। পয়সার অভাবে আমাদের পেটে দানাপানি মাঝে মাঝে পড়ে না, এই যা কষ্ট। সেখানে আমাদের প্রত্যেকদিন সার্কাস হয়, বানর নাচ হয়, প্রত্যেকদিন বানরটাকে কত রকম পোষাকে সাজিয়ে দেওয়া হয়। তা'ছাড়া প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই নাটক হয়। সেখানে যারা পার্ট নেয় তারা গলা ফাটিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়। থিয়েটারে যখন তাদের যুদ্ধ হয় তখন কি মজা। যতক্ষণ না সকলে মরে যাবে ততক্ষণ এই যুদ্ধ চলতেই থাকবে। এই মজার নাটক দেখতে মাত্র এক ফার্দিং লাগে। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমাদের এই সামান্য এক ফার্দিং পয়সা যোগাড় করাই এত কষ্ট যে কি আর বলবো।"

"আচ্ছা সেখানে আরও কি হয় ?"

"পাকা লাঠি খেলোয়াড়দের খেলা দেখি। আমরাও লাঠি খেলা করি।"

"এই খেলাটা আমিও খুব ভালবাসি। তুমি আর কি কর ?"

"বাজি রেখে রেসের ঘোড়ার মত দৌড়াদৌড়ি করি।"

"আমার মনে হয় ওটা ও আমার খুব ভাল লাগে, আর কি কি কর সব বল দেখি ?"

"গরমের সময়ে আমরা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীর কাছের নদী ও খালের জলে ছুটোছুটি করে থাকি। আবার কোন কোন দিন দল বেঁধে সাঁতার কাটি। সাঁতারে পাল্লা দেবার সময় কি মজা করেই না আমরা সকলে জল ছিটাই, আর ডুব দিই। আর যখন এই রকম ক'রে পাশের ছেলেটাকে জল ছিটিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি তখন যে কি হৈ হৈ হয়".....

টম্ তার কথা শেষ না করতেই যুবরাজ বলে ওঠেন, "আমি যদি একবার অই স্ফূর্ত্তি করতে পাই—তাহ'লে যুবরাজ হ'তে আর আমি চাই না—সিংহাসনও ছেড়ে দিতে পারি। তুমি আরও ভাল করে আমাকে সব খেলার কথা বল।"

টম্ অতি উৎসাহের সংগে বলে চলে—"মেপোলের রাস্তায় আমরা দল বেঁধে গান গাইতে যাই ; আবার কোন কোন দিন আমাদের দল বেঁধে নাচও হ'য়ে থাকে। বালুর ওপর দৌড়াদৌড়ি করবার সময় বৃষ্টি হ'লে কাদার ওপর খেলার যে মজাটা হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। সেই নরম কাদামাটি দিয়ে আমরা যে সব খাবার তৈরী করি তা'

আপনি কখনও দেখতেন! আমার ত' মনে হয় তেমন সুন্দর কাদাই বড় দেখা যায় না। আর তা' দিয়ে খাবার তৈরী করতে কি ভাল লাগে! সময় সময় ত' আমরা কাদা মধ্যে মনের সুখে গড়াগড়ি দিয়ে উঠি।"

আর বোলো না, আর বোলো না টম্। আহা! এ আনন্দের তুলনাই হয় না। আমার কি মনে হচ্ছে জান? যদি আমি তোমার মত জামা কাপড় পরে কোনদিন রকম কাদায় ছুটোছুটি করবার সুযোগ পাই—আর যদি এমনটি হয় যে কেউ আমাকে আনন্দে বাধা দেবে না, গালিমন্দ করবেনা—তা' হলে আমার—ত' মনে হয় আমি জ্যই ছেড়ে দেবো!"

যুবরাজের দেখাদেখি টম্ও মনের কথা বলবার জন্য উদগ্রীব হ'য়ে ওঠে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[যুবরাজ ও টমের পোষাক বদলের কাহিনী]

"যুবরাজ যদি কিছু মনে না করেন তবে আমার মনের সাধও বলবো?"

যুবরাজ নির্ভয় দিয়ে ইঙ্গিত করতেই টম্ দম্ বন্ধ ক'রে বলে ফেললো : "যদি আপনার মত পোষাক পরতে পারতাম!"

যুবরাজ হেসে বললেন,—"ও হো, তোমার বুঝি এই পোষাকটা খুব পছন্দ? আচ্ছা দাঁড়াও তাই করবো। তোমার ঐ জামা কাপড় ছেড়ে ফেলে আমার এই চক্‌চকে পোষাকগুলি তুমি একবার পর দেখি। যখন এগুলি পরবে তখন দেখবে ঐগুলি মাত্র কিছুক্ষণের জন্য ভাল লাগবে। অবশ্য তা হলেও পরবার ইচ্ছেও যে না থাকবে তা নয়।"

"আচ্ছা, তবে এস, কেউ আসবার আগেই আমার পোষাকটা তুমি পর, আর তোমার পোষাকটা আমি পরি। কেউ এলে আর তোমার এটা পরা হ'য়ে উঠবেনা।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল তারা উভয়েই পোষাক বদল করেছে। দেখা গেল, যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ এক ভবঘুরে ভিখিরী বালক টম্ ক্যান্টির পোষাক স্বচ্ছন্দে পরেছেন আর যুবরাজের বিচিত্র বেশে ভিখারী বালক টম্ সজ্জিত হ'য়েছে। তারা দু'জনে যখন ঘরের একটী আয়নার কাছে এসে পাশাপাশি দাঁড়ালো—তখন যেন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে গেল। তাদের দেখে মনে হয় না যে কোন কিছুর পরিবর্তন হ'য়েছে। তারা একে অপরের দিকে অতি আশ্চর্য্যের সংগে বারে বারে তাকাতে থাকে আর আয়নায় নিজেদের চেহারা বারে বারে দেখতে থাকে। অবশেষে পরম বিস্ময়ের সংগে যুবরাজ টম্ ক্যান্টিকে বললেন, "তোমার কি মনে হচ্ছে?"

"প্রভু, আমার মত ছোটলোককে বলতে আদেশ করবেন না।"

যুবরাজ বলে উঠলেন, "বেশ তাহলে আমি বলছি শোন। দেখ, তোমার চুল, আর আমার চুল একরকম। তোমার চোখ, গলার স্বর, তোমার চাল চলন সবই আমার মত এমন কি ব্যবহারেও কোন তফাত নেই। আমি যতটা উচু, তুমিও ততটা এবং তোমার শরীরের গড়ন ঠিক আমারই মত। এমন কি আমার মুখের চেহারা আর তোমার মুখের চেহারায় এতটুকু তফাৎ নেই। যদি আমরা আমাদের এই জামাকাপড়গুলি ছেড়ে ফেলে দিই তাহলে আমাদের মধ্যে কে প্রিন্স অব ওয়েলস্ আর কে তুমি কেউ তা' ধরতেই পারবে না।"

তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে যুবরাজ বললেন, "আর আমার মনে হয় ঐ নির্দয় সৈনিক যেরূপভাবে তোমাকে আঘাত ক'রে ছিল, তোমার এই বেশ পরে এখন তা' কিছু বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তোমার হাতের ঐ আঘাতের চিহ্নটা ত' ওরই মারের ফল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, যুবরাজ; এ সামান্য আঘাত। আর আপনি ত' জানেন যে বেচারী সৈনিক—"

যুবরাজ তাঁর খালি পা-টা সজোরে মাটীতে ঠুকে টমকে বললেন, "চুপ কর। এই ঘটনা শুধু নির্ম্মমই নয়, লজ্জার কথাও বটে। যদি আমার বাবা স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের কানে এই কথা ওঠে……শোন আমি না আসা পর্য্যন্ত এখান থেকে তুমি এক পাও নড়বে না। মনে রেখো, এ আমার আদেশ।" এই কথা বলে ঝড়ের বেগে এক নিমেষের মধ্যে যুবরাজ ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন। যাবার সময় টেবিলের ওপর থেকে কি একটা জিনিষ নিয়ে গেলেন ইংলণ্ডের রাজ পরিবারের পক্ষে যার গুরুত্ব নাকি খুবই বেশী।

দপ্ দপ্ করে পা ফেলে যুবরাজ যেন একরকম উড়তে উড়তে এসে প্রাসাদের দ্বারপ্রান্তে টম্ ক্যান্টির জামাকাপড় পড়ে উপস্থিত হলেন। তখন রাগের চোটে চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। রাজপ্রাসাদের লোহার বিরাট দরজার একপ্রান্ত ধরে প্রাণ-পণে নাড়া দিয়ে আদেশের ভংগীতে উচ্চকণ্ঠে রক্ষীকে নির্দেশ দিলেন, "দরজা এই মুহূর্তে খুলে দাও।"

(চলবে)

|:—:|

তুফান

শ্রী যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[**পূর্ব্বাভাষ**—অরবিন্দ বোস্ একজন নাম করা গোয়েন্দা, কিরণ সেন তার বন্ধু ও সুযোগ্য সহকারী। একদিন কিরণ সেন তার দূরবীন দিয়ে ঘরের জানালার ভিতর দিয়ে দেখলে বহু দূরে নদীর চড়ায় কে বা কাহারা একটী ছোট শিশুকে বেঁধে রেখে গেছে। নদীটি কুমীরে ভর্ত্তি, চড়াটির নাম কুমীরের চড়া। একটু পরে জোয়ার এলেই কুমীরের পেটে যাবে ছেলেটি। ছেলেটিকে উদ্ধারের জন্য গোয়েন্দা অরবিন্দ বোস্ তার সহকারী কিরণ সেনকে পাঠিয়ে দিলো। সহকারী চলে যাবার পরই জলঝড়ে আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। অরবিন্দ সহকারীর বিপদ বুঝে চিন্তায় আকুল হয়ে উঠলো। ইতি-মধ্যে আবার কোথাকার কে এক নয়াগড়ের রাজকুমার টেলিফোন করে অরবিন্দকে বাড়ী থাকতে বললো। তার নাকি বিশেষ দরকার অরবিন্দের সঙ্গে। আসলে কিন্তু এটা একটা ধাপ্পা। কৌশলে গোয়েন্দা অরবিন্দকে বাড়ীতে আটক রাখাই দুর্ব্বৃত্তদের একটা চক্রান্ত। অরবিন্দ একথা বুঝলো অনেক পরে। তখন আর সময় নষ্ট না করে অরবিন্দ এক কাঠওয়ালা সাঁও-তালকে সঙ্গী করে সহকারীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লো একখানা জেলে ডিঙ্গি নিয়ে। উত্তাল তরঙ্গের মাঝে জেলে ডিঙ্গিখানা রক্ষা করা দায়, এমন সময়ে একখানা বড় নৌকা এসে পড়লো একেবারে তাদের ঘাড়ের উপর। ভগবানের নাম স্মরণ করে ওরা নদীতে ঝাঁপ দিলো আর বহুকষ্টে সাঁতরে সেই চড়াটায় গিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলো। শীঘ্রই দুজনের পায়ের তলায় শক্ত মাটির ছোঁয়া পেলো। চড়াটায় তারা পৌঁছে গেছে। চড়ায় উঠে এদিক ওদিক অনুসন্ধানের সময় কার একটা প্রচণ্ড আঘাত অতর্কিতে অরবিন্দের মাথায় বজ্রাঘাতের মত এসে পড়লো। অরবিন্দ জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়লো। অরবিন্দের যখন জ্ঞান ফিরে এল সে দেখলো একটা ঘরে সে বন্দী। ঘরটিকে একটি দুর্ভেদ্য কারাগার বলা চলে। হঠাৎ একজন অপরিচিত

ব্যক্তির দেখা মিলল। তার কথাবার্ত্তা শুনে মনে হলো তারা অরবিন্দকে চেনে আর তাকে তাদের পথ থেকে সরিয়ে ফেলবার জন্যই বন্দী করেছে। সেই মুহূর্ত্তে আর একজন এসে খবর দিল যে বন্দী কিরণ সেন পলায়ণ করেছে।]

চার

গোয়েন্দা অরবিন্দ বোস গুপ্ত শত্রুর দ্বারা অতর্কিতে আক্রান্ত ও বন্দী হবার পর থেকে সব ঘটনা মংলুর চোখের সামনেই ঘটে গেছে। ভগবানের কৃপায় মংলু একটু পিছনে ছিল বলে শত্রুরা তার খোঁজ পাইনি কিন্তু তারপর থেকে দুটো তিনটে দিন মংলুর যে কি ভাবে কেটেছে তা সে নিজেই জানে। সারাদিন গাছের মাথায় বসে, রাতের বেলায় শুধু গাছের ফল—পেয়ারা আর জাম খেয়ে তার দিন কেটেছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চারিদিক দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ভরে গেছে। এবারে মংলু ধীরে ধীরে তার আশ্রয়স্থল বড় একটা গাছ থেকে নেমে আসছে। কি আশ্চর্য্য! আর একটা লোকও যে নীচের দিকে একটা ডালে গুটি সুটি মেরে বসে রয়েছে। অন্ধকার হলেও মংলু বেশ দেখতে পেলো, একটি মনুষ্যমূর্ত্তি ওটা! আগে অতটা লক্ষ্য করেনি, একেবারে তার ঘাড়ের কাছে নেমে এসেছে মংলু। এখন আর লুকোবার উপায় নেই। কাজে কাজেই সাহসে ভর করে গর্জ্জে উঠলো মংলু···তুমি কে? লোকটাও সমানভাবে জবাব দিল, "তুমি কে?"

"হায় ভগবান্···এযে ছোটবাবুর গলা। আনন্দের আতিশয্যে ডাক ছেড়ে চীৎকার করতে ইচ্ছা হলো তার। কোনরকমে নিজেকে সংযত করে বেশ জোরেই ব'লল সে, "ছোটবাবু, আমি মংলু।"

"কে তুমি মংলু? আস্তে আস্তে কথা বলো।"

"আজ্ঞে, আমি আপনাদের বাড়ীতে বড়বাবুকে কাঠ দিই, আমি সেই সাঁওতাল মংলু।" গলার স্বর নীচু করে মংলু বললো।

"তুমি এখানে কি করে এলে মংলু?"

"আমি আর বড়বাবু আপনার খোঁজে এখানে এসেছিলুম। ওরা বড়বাবুকে ধরে নিয়ে গেছে আমি একটু পিছিয়ে ছিলাম কিনা তাই আমার খোঁজ ওরা পায়নি। হা ভগবান, আর কি বড়বাবুকে ফিরে পাবো?"

....“কিন্তু তুমি পিছিয়ে পড়েছিলে কেন মংলু?” কিরণ জিজ্ঞেস্ করে।

মংলু বললো, “আমার পায়ে কি একটা বিঁধেছিল ছোটবাবু! তাই আমাকে পিছিয়ে পড়তে হয়। একবার ভেবেছিলুম বড়বাবুকে ডেকে একটু থামতে বলি। কিন্তু তখনই ভয় হলো, কি জানি যদি কেউ শুনতে পায়। ভাবলুম, পায়ে যা বিঁধেছে সেটাকে আগে বার করে নিই, তারপর ছুটে গিয়ে বড়বাবুকে ধরলেই চলবে। কিন্তু তা আর হলো কই ছোটবাবু? এরই মাঝে হয়ে গেলো সর্ব্বনাশ!”

কিরণ এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে রইলো, তারপর, আবার জিজ্ঞেস্ করলো, “তুমি জানলে কেমন করে যে বড়বাবুকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে, আর কোথায় যে তাঁকে রেখেছে, তা'ইই বা জানলে কেমন করে?”

....“বা! সে সমস্ত ব্যাপারটা যে আমার চোখের ওপর হয়ে গেলো বাবু!” মংলু বুঝি তার স্মৃতিশক্তিকে একটু জাগিয়ে নেওয়ার জন্য এক সেকেণ্ড নীরব থেকে আবার বলতে সুরু করে, “পায়ের কাঁটা খুলবার পরক্ষণেই আমি ছুটতে সুরু করি বড়বাবুর দিকে। কিন্তু কয়েক গজ এগিয়ে যেতেই আমার চোখে পড়ল বিরাট এক কুমার ঠিক্ সেই পথে, তাঁরই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে!

বল্‌লে বিশ্বেস করবেন না ছোটবাবু, কি যে ভয়টা আমার হলো! ভাবলুম, বড়বাবুকে আজ এই কুমীরেই খেয়ে ফেলবে। তাই তাঁকে সাবধান করবার জন্য বলতে যাব, এম্‌নি সময় হঠাৎ দেখি কুমীরটা থামলো এক মুহূর্ত্তের জন্য, আর সেই ফাঁকে তার পেটের একটা জায়গা দিব্যি কপাটের মত খুলে গেলো ও তার ভেতর থেকে দুটো লোক বেরিয়ে এলো! হাতে তাদের লাঠি!

ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি একটু সরে দাঁড়ালুম। আর সেখান থেকে দেখলুম যে, একটা লোক ঝাঁ করে এগিয়ে গিয়েই বড়বাবুর মাথায় মারলে লাঠির আঘাত।

এ সমস্তটা ব্যাপারই হয়ে গেল বুঝি চোখের পলকে! আমি তাঁকে লুটিয়ে পড়তে দেখলুম ছোটবাবু, কিন্তু কোন সাহায্যই করতে পারলম না, অথচ হাতে আমার লাঠি ছিল তখনো!

যাহোক, এরপর বড়বাবুকে তারা চ্যাংদোলা করে তুলে কুমীরের পিঠেই বেঁধে নিলে ও তারা নিজেরা ঢুকে পড়লো আবার কুমীরের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে কুমীর ছুটে চললো কত ঝোপ-ঝাড় বন-বাদাড় ভেঙে! আর আমিও ছুটলুম তার পিছু পিছু।

কত উঁচু নীচু জায়গা, কত ঘুরন্ত পথ ও কত ঝোপ-ঝাড় যে এ চড়ার মধ্যে ছিল, তা' কে আগে জানত ছোটবাবু? কাজেই প্রথমে একবার ভয় হয়েছিল, কি জানি, ফিরে আসবার পথ যদি খুঁজে না পাই!

কিন্তু একটু লক্ষ্য করতেই আমার সে আশংকা দূর হলো। কারণ, আমি দেখলুম, যেদিকে আমাদের পথ, কে যেন লতাপাতা ও ঝোপ-ঝাড়েব মাথাগুলো ঠিক সেইদিকেই মুচড়ে রেখে দিয়েছে!"

কিরণ একটু হাসলো, তারপর মৃদুস্বরে বললো, "সে আমারই কীর্ত্তি মংলু।"

—"আপনার কীর্ত্তি?"

—"হ্যাঁ। একটু কৌতূহলী হয়ে আমি যখন একটা লোককে অনুসরণ করতে সুরু করি আর সে যখন অবিরত নানা ঘুরপথে এগিয়ে যেতে সুরু করলে, তখন পথটা চিনে রাখবার জন্য আমিই ওকাজ করেছিলাম, আর ভেবেছিলাম, অরবিন্দও যদি এখানে আসে কোন কারণে, তাহলে আমার এই সঙ্কেত হয়তো তাকেও অনেকটা সাহায্যই করবে।"

কিরণ সেন কিছু তৃপ্তির সঙ্গে এই কথাগুলো বললো। তারপর একটু থেমে সে জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু তারপর কি হলো মংলু? অরবিন্দ কোথায় আছে তা জান তুমি?"

...."হ্যাঁ জানি বৈ কি! কুমীরকে অনুসরণ করে আমি তো ওদের সমস্ত আড্ডাই দেখে এসেছি!" মংলু আবারও বলতে সুরু করে, "বড়বাবুকে ওরা প্রথমে নিয়ে যায় বোধ হয় ওদের এক সর্দ্দারের কাছে। বেশ জোয়ান চেহারা, সাজ পোষাকের ভড়ং আছে খুব, সুন্দর বাংলা বলে, কিন্তু বাঙ্গালী নয়, নামটা সম্ভবতঃ কি এক "পিলাই"! একজন লোক তাকে 'পিলাইজি' বলে সম্বোধন করলে।

"বড়বাবুকে দেখে পিলাইজি খুব খুশী হলেন, তারপর তাঁরই হুকুমে তাঁকে যেখানে আটকে রাখা হলো, সে জায়গাও আমি দেলুখম।"

"তারপর, আপনি ও তো ওদের হাতে ধরা পড়েছিলেন, আপনি পালিয়ে এলেন কি করে?" মংলু ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করল।

(চলবে)

মিশর আক্রমণ

শ্রী জয়শ্রী বসু

সুয়েজ সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সমগ্র জগৎ উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। আর ক্ষমতা-মদ-মত্ত ইংরেজ ও ফরাসী গোষ্ঠী চাইছিল যেন তেন প্রকারেণ মিশরীয় শক্তি খর্ব্ব করতে। রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে ইস্রায়েলকে উস্কানী দিয়ে মিশরের ওপর তাই হঠাৎ হলো আক্রমণ। আর এই সুযোগে ১৯৫০ সালের ত্রিপক্ষীয় চুক্তির সুযোগ নিতে ছাড়লো না বৃটেন ও ফ্রান্স। ঐ চুক্তি অনুসারে আরব ও ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির সর্ত ভঙ্গ হলে তাতে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা রয়েছে আমেরিকা, ফ্রান্স ও বৃটেনের। সুতরাং '৫০ সালের এই চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে বলে ফ্রান্স ও বৃটেনের আর এক দফা যুদ্ধে বাধা কোথায়?

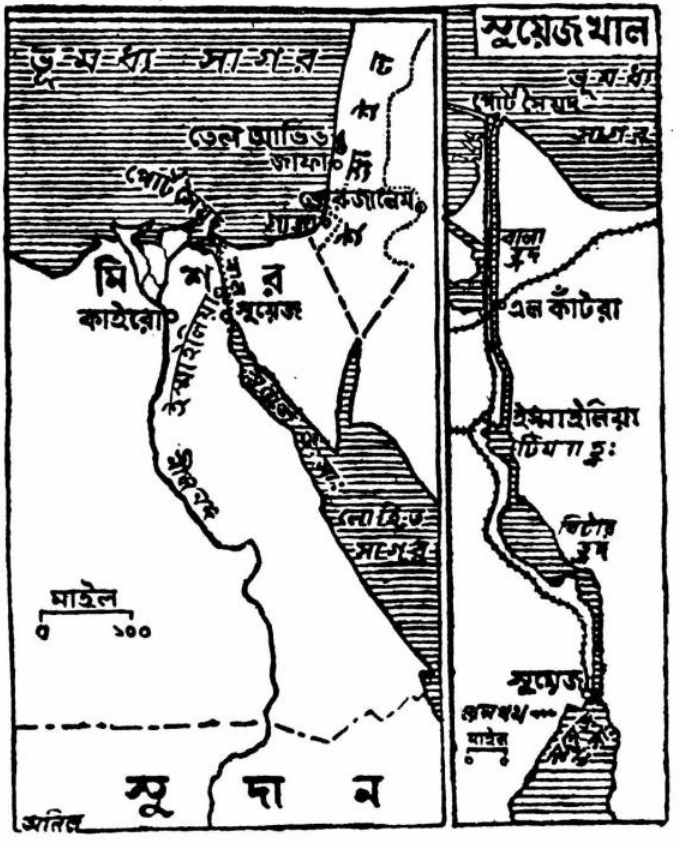

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীদ্বয় মিঃ এণ্টনী ইডেন ও মঃ মলে যুক্ত-ভাবে ১২ ঘণ্টার মেয়াদে মিশর ও ইস্রায়েলকে যুদ্ধ বিরতির নির্দ্দেশ দিয়ে জানালেন যে অবিলম্বে সুয়েজ খাল এলাকা থেকে দূরে সরে যেতে হবে, সুয়েজ খাল উন্মুক্ত করে দিতে হবে এবং পোর্ট সৈয়দ, ইসলামিয়া

ও সুয়েজকে অবিলম্বে অস্থায়ীভাবে এদের হাতে তুলে দিতে হবে। এই চরম পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে বৃটেন ও ফ্রান্স নিজের হাতেই তুলে নেবে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার, একথাও জানান হলো।

কোন স্বাধীন রাষ্ট্রই এ রকম অসম্মান-জনক প্রস্তাব মেনে নিতে পারে না, মিশরও মানে নি। নির্ভিক কণ্ঠে নাসের এর প্রতিবাদ করেছেন এবং যুদ্ধ প্রতিরোধ করে গেছেন। বৃটেন ফ্রান্স যদিও ইস্রায়েল ও মিশর উভয়কেই সতর্ক করেছিলেন, তবুও সামরিক আক্রমণ চালিয়েছে মিশরের বিরুদ্ধেই। এদের উদ্দেশ্য (১) মিশরকে দুর্ব্বল করে ফেলা (২) সামরিক চাপ দিয়ে মিশরের আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ঘটিয়ে নাসেরকে পদচ্যুত করা, (৩) সুয়েজ খালে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য মোতায়েন করে মিশরের ক্ষমতা খর্ব্ব করা (৪) এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মিশরীয় অঞ্চল ইস্রায়েলকে ঘুষ দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বাড়ান, কারণ বর্ত্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-ফরাসীপ্রভুত্বে একমাত্র প্রহরী আজ ইস্রায়েল।

পোর্ট সৈয়দে বৃটিশ সৈন্যের তৎপরতা।

ঘটনার এই আকস্মিকতায় বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভের সৃষ্টি হল। ইস্রায়েল, ফ্রান্স ও বৃটেন আর একবার সমগ্র বিশ্ব জগতের ঘৃণা কুড়োল। গোড়া থেকেই আমেরিকার ইচ্ছা ছিল না মিশরের প্রতি বল প্রয়োগের। আগেই মিঃ ডালেস স্বস্তি পরিষদে প্রস্তাব করেছিলেন যে, মিশরকে বল প্রয়োগের হুমকি দিতে রাষ্ট্র সমূহ যেন বিরত থাকে। কিন্তু আমেরিকাকে ডিঙিয়ে এরা অস্ত্র ধারণ করল। তখন একটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকা এড়াতে বিশ্ববাসী স্মরণ নিল রাষ্ট্রসংঘের। স্বস্তি পরিষদে স্বয়ং ডালেস প্রস্তাব করলেন যুদ্ধ বিরতির এবং বিপুল ভোটাধিক্যে এই প্রস্তাব গৃহীত হলো। ৬৪টি রাষ্ট্র এই প্রস্তাব সমর্থন করে এবং বৃটেন, ফ্রান্স, ইস্রায়েল ছাড়া মাত্র দুটি রাষ্ট্র তাও কমনওয়েলথ ভুক্ত অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।

এতদিন পর্য্যন্ত বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা একজোটে রাষ্ট্রসংঘের অনেকটা শক্তি অধিকার করেছিল, আজ সেই শক্তিতে ভাঙ্গন ধরলো এবং একটা আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়ে রাশিয়া ও আমেরিকা হলো একমত। রাষ্ট্রসংঘ যুদ্ধ বিরতির নির্দ্দেশ দেবার পর সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী বুলগানিন বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক সতর্কবাণী পাঠালেন যে, অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ না করলে রাশিয়া আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে।

যাই হোক রাষ্ট্রসংঘের আদেশ, আইসেন হাওয়ারের নির্লিপ্ততা, বুলগানিনের হুমকী, নেহরুর নিন্দা অবশেষে একটা বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে পেরেছে বলে সকলেই সুখী। রাষ্ট্রসংঘ মিশর থেকে আক্রমণকারীদের সৈন্য বাহিনী অপসারণের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এবং একদল আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীকে পাঠালেন মিশরের শান্তি ফিরিয়ে আনতে।

আশা করা যায় এদের মিশর প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই শান্ত হয়ে যাবে মিশর রণাঙ্গনের অবস্থা তবে মিশরের ক্ষতি যা হবার তাতো হয়েছেই। কয়দিন হানাদারদের আক্রমণের ফলে মিশরকে যে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নেই।

মিশরের উপর এই আক্রমণ সম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লর্ড এটলী বলেছেন, "এ শুধু নির্ব্বুদ্ধিতা বা গোঁয়ার্ত্তুমি নয় এ হলো রীতিমত পাগলামি।"

গোঁয়ার্ত্তুমি হোক আর পাগলামি হোক যা থেকে সমস্ত পৃথিবীর শান্তি ও নিরপত্তা বিপন্ন হতে পারে, সে ধরণের পাগলামিকে সাধারণ ব্যাপার বলে উপেক্ষা করা চলেনা। পাগলদের মাথায় অপরিকল্পিত কোন মতলব থাকেনা, কিন্তু এ ধরণের পাগলামির পিছনে তা ছিল। সুতরাং এ ধরণের পাগলামি সংযত করবার জন্য যাহা প্রয়োজন; বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিকে সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। আজ মিশরের দুয়ারে সাম্রাজ্যবাদীরা হানা দিচ্ছে, কে বলতে পারে ভবিষ্যতে অন্য কোন রাষ্ট্রের উপর এই অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি হবে না? তা হলে বিশ্বশান্তির ভরসা কোথায়?

|:—:|

TOTA PRODUCTS
High class Ink Manufacturer
3/2, Shyama Charan De St.
Calcutta. 12.

ভারত বিখ্যাত টোটা পাউডার
TOTA
1941
SPECIAL POWDER INK
BLUE BLACK WRITING INK
TOTA PRODUCTS
CALCUTTA
কালী ব্যবহার করুন

চাষের গুরুত্ব

শ্রীসুজ্যোতি নাথ চট্টোপাধ্যায়
(অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগ)

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে চাষের স্থান অতি উচ্চে। আদিম যুগে মানুষ খাবার ও দরকারী জিনিষগুলি যোগাড়ের জন্য দলবদ্ধ হয়ে শিকারে বেরুত আর বনবাদাড়ের ফলমূল আহরণ করে নিজেদের জীবন ধারণের প্রয়োজন মেটাত। তারপর আর্য্যজাতি ভারতের মাটিতে পা দিয়ে সে যুগের পরিবর্ত্তন এনে দিলেন। তাঁরা ছিলেন অনেক সভ্য। মাটি চষে, বীজ বুনে, জলসেচন করে শস্য ফলাবার উপায়টি তাঁরা আবিষ্কার করলেন। এই আবিষ্কারের ফলে সভ্যতার ক্রম বিকাশের ভিত্তি গড়ে উঠলো। দিনে দিনে আদিম মানব জীবনে সমাজ ব্যবস্থা, রাজ্য গঠন প্রভৃতির পথ সুগম হয়ে উঠলো। তখন থেকে চাষ বাষের গুরুত্ব মানুষ স্বীকার করে নিল।

অরণ্য জীবন থেকে চাষবাষ মানুষকে নূতন পথের সন্ধান দিল। আর্য্য ঋষিরা ধরণীকে শস্যশামলা করবার জন্য নানাভাবে বৃষ্টি-বারির বন্দনা করতে আরম্ভ করলেন। বেদে এই বারি বন্দনার কথা উল্লেখ আছে। তারপর চরক, শুশ্রুত প্রভৃতি দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন ঋষিগণ লতাপাতার ভিতরে ঔষধের কি গুণ আছে তারই পরীক্ষা করতে আরম্ভ কয়লেন। তার ফলেই জন্ম নিলো আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র। উপনিষদে মুনিঋষিদের উপদেশ আছে—অন্নং বহু কুর্ব্বিতঃ ব্রতম—অর্থাৎ অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন কর, ইহাই তোমার ব্রত হোক। সংহিতায় পরাশর মুনি বৃষ্টি ও বীজ সংগ্রহের বিয়য়ে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তার অনেকদিন পরে খনার বচনে কৃষি বিষয়ে অনেক উপদেশ প্রচারিত হলো।

কাজেই দেখা যাচ্ছে মানুষের জীবনে কৃষির গুরুত্ব আদিম যুগ থেকেই উপলব্ধি করা হয়েছিল। প্রস্তর যুগের আগে হরিণের শিং দিয়ে ভূমি কর্ষণ করা হতো। প্রস্তর যুগে পাথরের ফলা দিয়ে জমি চষার কথা শোনা যায়। তারপর লৌহযুগে পা দিয়ে মানুষ প্রয়োজন মত লোহার অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিখে নিল। আজ আমরা কতই না অস্ত্রশস্ত্র চাষের কাজে ব্যবহার করতে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এই কাজে সর্ব্বপ্রথম মানুষ ব্যবহার করেছিল হরিণের শিং। তাহলে হরিণের শিংই হলো আমাদের প্রথম লাঙ্গল।

সভ্যতার অঙ্গ বলে যে শিল্পগুলো আজ আমাদের চারদিকে গড়ে উঠেছে তার বেশীর ভাগই কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভর করে। পাট, কাগজ, চাল, তেল, আটা, গম, এই ধরণের সব শিল্পই চাষ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

দেশে খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষ হলে সব শিল্পই বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা চরমে গিয়ে পৌঁছায়। বৃটিশ শাসনের সময় দুর্ভিক্ষের কারণ নির্দ্ধারণ ও নিবারণের জন্য অভিজ্ঞ লোক দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই সকল তথ্যের ভিত্তিতেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সরকারী কৃষি বিভাগ, কৃষি শিক্ষা আর কৃষি গবেষণার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

ভারত এখন স্বাধীন হয়েছে। ভারত সরকার কৃষির গুরুত্ব উপলব্ধি করে, তাঁদের প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থ মঞ্জুর করেছেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার হরিণঘাটায় কৃষিকলেজ, গবেষণা মন্দির, বিরাট গোশালা আর পক্ষীপালনের ব্যবস্থা করে এই বিষয়ে কল্যাণমূলক কাজে ব্রতী হয়েছেন।

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশগুলিও কৃষির গুরুত্ব উপলব্ধি করে অত্যন্ত উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি আর কলাকৌশলের প্রয়োগ সুরু করেছে। তাতে এই সকল দেশ উন্নত ধরণের কৃষির দ্বারা প্রভূত সমৃদ্ধিশালী হয়েছে।

আমাদের দেশে এখন জমিদারী সত্ব বিলোপ হওয়ায় চাষীদের সুবিধা খুবই হবে আশা করা যায়। জমির মালিকত্ব চাষীর হাতে এলে চাষী পুরা উৎসাহে নিজ বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলবে সন্দেহ নেই।

শুধু জমি চাষ করে শস্য উৎপাদনের মধ্যে কৃষিকাজ সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতিজাত। খনিজসম্পদ ছাড়া মানুষের ব্যবহারোপযোগী প্রাণীজ বা ভেষজ দ্রব্য যাহা কিছু আমরা ভূমি থেকে সংগ্রহ বা উৎপন্ন করি তাহাও ব্যাপকভাবে কৃষির পর্য্যায়ে পড়ে। এইজন্য নানাবিধ ফসল উৎপাদন, গোপালন, ছাগপালন, মৎস্য চাষ, ফলের চাস, মৌমাছি পালন, গুড় বা চিনি তৈয়ারী, গাছের চাষ, গালার চাষও কৃষিকাজ বলে গণ্য হয়। মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন বৃত্তি কৃষির কতখানি যে ব্যাপকতা আর গুরুত্ব আছে আমরা এই থেকেই ঝতে পারি।

গড়গড়া গাঙ্গুলীর গল্প

বাঘের ম্যালেরিয়া

বীরু চট্টোপাধ্যায়

কথা চলছিলো শিকার সম্বন্ধে।

গাঙ্গুলী মশায় গম্ভীরভাবে গড়গড়া টেনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "শিকারের কথা যখন উঠলো, তখন আর না বলে পারছিনা কাহিনীটা।"

সকলেই গাঙ্গুলী মশায়ের মুখের দিকে তাকালো, একটা কিছু অভাবণীয় কাহিনী হয়ত শুনতে পাওয়া যাবে এখনই। এমন একটা জমকালো আসরে গাঙ্গুলী মশাই আর কতক্ষণ থাকবেন চুপ করে!

গাঙ্গুলী মশাই কাহিনী সুরু করলেন।

রামপালের রাজা ভৃগুসেন ধরে বসলেন, শিকারে যাবেন আমাকে সঙ্গে যেতে হবে। তখন আমার যোয়ান বয়স, হাতের পেশীগুলো ঠিক যেন লোহার মত, বুকের ছাতি ছিল আটচল্লিশ। রাজবাড়ীতে চাকরী করি, রাজা ছাড়বেন কেন? শেষ পর্য্যন্ত মত দিতে হলো।

রাজবাড়ীতে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। লোক লস্কর, পাইক, বরকন্দাজ সব প্রস্তুত হলো। দু ডজন পানসী নৌকা সাজানো হলো, একটা ভর্ত্তি হ'লো শুধু রাইফেল, গোলা, গুলি আরো কত কি অস্ত্রে শস্ত্রে! রাজবাড়ীর ব্যাপার একটু বাড়াবাড়ি হবে বৈকি?

যথা সময়ে দুর্গা বলে পানসী ভাসিয়ে দেওয়া হলো। পঞ্চাশ মাঝি, দেড়শ দাঁড় ফেলে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল টানতে লাগলো। ছ' ঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম ছ' দিনের পথ সুন্দর বন। রয়েল বেঙ্গল টাইগার ওখানে ছাড়া মিলবে কোথায়?

আহা সুন্দরবনতো সুন্দর বনই! সে কি দৃশ্য! চোখ জুড়িয়ে যায়। প্রকৃতি দেবী যেন নিজের হাতে সাজিয়ে রেখেছেন বনটিকে। চন্দন গাছের ভেতর দিয়ে ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, শিকার করবে কি গলা ছেড়ে গান গাইতে আরম্ভ করলেন রাজামশাই।

বললুম, "রাজামশাই শিকারে এসেছেন ডিসিপ্লিন মেনে চলুন, নইলে শিকার পণ্ড হয়ে যাবে, ভুলেও এপথ মাড়াবেনা ওরা।"

রাজামশাই আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, ঠিক বলেছো গাঙ্গুলী—কিন্তু শিকার চাই, এত আয়োজন বিফল না হয়। বললুম, "আমি যখন সঙ্গে আছি সে ভয় আপনার নেই।"

দুই

একটা নদীর ধারে জঙ্গল সাফ করে আমাদের তাঁবু ফেলা হলো। নদীটিতে অগুনতি কুমীর, বড় বড় ময়াল সাপ, ঠিক যেন ইঁদুরছানা, বেড়ালছানার মত, কিল্ বিল্ করছে। ঐ না দেখে রাজামশাই ভয়ে উঠলেন আঁতকে।

আমি বল্লুম, কিছু ভয় নেই, রাতটা কাটুকনা, ব্যাটাদের মজা দেখাচ্ছি। এক এক ব্যাটার ল্যাজ ধরে মারবো এক একটা আছাড়, বাচ্ছা, ধাড়ী সবাই পালাবে ল্যাজ তুলে।.....

রাত্রি গভীর হলো। রাজামশাই আমার পাশটিতে চুপ করে শুয়ে আছেন, ঘুম আসছেনা তাঁর কিছুতেই। খাওয়া দাওয়াটা ভালই হয়েছিল, আমি শীঘ্রই নাক ডাকাতে সুরু করলুম।

হঠাৎ রাজামশাই আমাকে জড়িয়ে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলেন। কিসের একটা গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে তাঁবুটার ধারেই। আমার ঘুম ভেঙে গেল। বললুম, "কিছুনা—ওটা সিংহের গর্জ্জন। পশুরাজের রাগ হয়েছে। আমরা তার রাজত্বে সৈন্য সামন্ত নিয়ে ঢুকে পড়েছি কিনা তাই রাগ হয়েছে।"

"কি হবে গাঙ্গুলী?" —চোখ দুটো কপালে তুলে বললেন রাজামশাই।

"কি আবার হবে? যুদ্ধ হবে। ওরা সৈন্য সামন্ত নিয়ে আসুক—আমরাও ততক্ষণে তৈরী হয়ে নেবো।" বলে পাশ ফিরে শুলুম।

রাজামশাই বললেন, "দরকার নেই—চল কাল সকালেই আমরা বাড়ী ফিরে যাই।"

ঘুম চোখে ধমকে উঠলুম আমি। বল্লুম, "চুপ করুনতো—কাল বাঘ মেরে একেবারে বাড়ী যাবো। এত আয়োজন নষ্ট হতে দেবনা কিছুতেই—আমি যখন সঙ্গে আছি।"

ভগবানের কৃপায় সে রাত্রে আর কোন গর্জ্জন শোনা গেল না, পরের দিন বাঘ শিকারের আয়োজন সকাল থেকেই সুরু হয়ে গেল। মাচা-টাচা বাঁধা ব্যাপারে একজন দেশোয়ালী গ্রামবাসী আমাদের সঙ্গে জুটে গেল। আর কি বাঘ শিকার না করে ফিরছি!

তিন

মাচা বাঁধা হলো মাটি থেকে ২২ হাত ওপরে। বাঘ বাইশ হাতের বেশী লাফাতে পারেনা। বাইশ হাত লম্বা মই একখানা তৈরী করা হয়েছিল আগেই। আমি, রাজামশাই, দুজন সেপাই আর সেই দেশোয়ালী লোকটি বন্দুক ঘাড়ে করে মাচায় উঠে বসলুম।

রাত ঘোর হয়ে এলো, মিটমিটে জ্যোৎস্না। আশে পাশের জঙ্গল গুলোকে ভুতের মত দেখাচ্ছে। সাপের ফোঁস ফোঁসানি, ভল্লুকের ডাক, আরো সব নাম না জানা জন্তুর গর্জ্জন শোনা যাচ্ছিলো। চুপচাপ উৎকর্ণ হয়ে বসে আছি। মশায় কামড়াচ্ছে, উঃ! কি ভীষণ মশা! অথচ মশা মারবার উপায় নেই—শব্দ হলেই বাঘ সাবধান হয়ে যাবে। মুখ বুজিয়ে মশার কামড় খাওয়া ছাড়া উপায় বা কি?

হঠাৎ দেশোয়ালী লোকটি কাঁপতে সুরু করলো। গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম গা তার পুড়ে যাচ্ছে। কাঁপতে কাঁপতে লোকটি বললে, জ্বর এসেছে। ম্যালেরিয়া জ্বর। এখানে সকলেরই এরকম জ্বর হয়। আর জ্বর এলেই হয়ে পড়ে সকলে অজ্ঞান অচৈতন্য। আমরা তার গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে মাচার ওপরেই তাকে শুইয়ে রাখলুম। শুয়ে শুয়ে সে কোঁ কোঁ করতে লাগল। আমরা বন্দুক বাগিয়ে বাঘের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

রাত্তির তখন কটা হবে জানিনা। চারদিকের জন্তু জানোয়ার ডাক তখন থেমে গেছে। সচকিত হয়ে উঠলাম। হঠাৎ খড়্ খড়্ শব্দ হলো। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি—আরে এইতো এসে গেছে বাঘ বাবাজী। কি যে বিরাট চেহারা তার কল্পনাও করতে পারবেনা তোমরা। পাক্কা কুড়ি হাত লম্বা। রাজা মশাই ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। আমি সে দিকে না চেয়ে বাঘটাকেই

লক্ষ্য করতে লাগলুম। দেখলুম বাঘটা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। তারপর আমাদের মাচার তলাতেই শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে।

বন্দুক বাগিয়ে গুলি ছুঁড়তে যাবো এমন সময়ে দেশোয়ালী লোকটি আমার বন্দুকের বাঁটের ওপর সঙ্কেত করে বারণ করলো গুলি ছুঁড়তে।

"ব্যাপার কি, কি হলো তোমার ?—" ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলুম তাকে।

দেশোয়ালী লোকটি বললো, "দেখছেন না জ্বর এসেছে বাঘটার, ম্যালেরিয়া জ্বর—এখন দুঘণ্টা ও অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে থাকবে।"

"তাই নাকি—আমি আর রাজামশাই দুজনেই আনন্দে লাফিয়ে উঠলুম।

"হ্যাঁ····এদেশে বাঘ ভাল্লুক····ম্যালেরিয়ার হাত থেকে কারুরই রেহাই নাই।" ····জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে দেশোয়ালী লোকটি বলল।

তারপর আর কি। বড় একটা খাঁচা আমাদের তৈরীই ছিল। সেপাই দুজনকে সঙ্গে নিয়ে আমি তর তর করে নেমে এলুম একেবারে বাঘটার কাছে। বাঘের দুটো ঠ্যাং ধরলুম আমি, আর দুটো ঠ্যাং ধরলো ওরা দুজনে। খাঁচার মধ্যে পুরে ফেললুম বাঘটাকে। বেচারা বাঘ তখনও জ্বরে থর থর করে কাঁপছে। তাঁবুতে ফিরে এসে বাঘের বগলে থার্মোমেণ্টার দিয়ে দেখলুম জ্বর একশো দশ ডিগ্রীর ও বেশী। একশো গ্রেণ কুইনাইন খাইয়ে মোটা মোটা খান কয়েক কম্বল চাপা দিয়ে তাকে খাঁচার মধ্যে শুইয়ে খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিলুম।

পরের দিন বাঘের জ্বর ছেড়ে গেল। আমরাও খাঁচা সমেত তাকে নিয়ে ফিরে এলুম ভৃগুসেনের বাজবাড়ীতে। এই ক বছর হলো বাঘটা গলায় মাছের কাঁটা বিঁধে মারা গেছে। নইলে তোমাদের সব দেখিয়ে আনতুম বাঘটাকে।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে শুনে গেলুম গল্পটা। গাঙ্গুলী মশায়ের মুখের ওপর কোন কথা বলবার স্পর্দ্ধা আমাদের নেই। সুন্দরবনে সিংহ এলো কোথা থেকে সেই কথাই ভাবছিলাম তখন।

রেল দুর্ঘটনার খতিয়ান

রেলওয়ে সমূহের প্রধান সরকারী ইন্সপেক্টারের বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতীয় রেলওয়ে সমূহে ১২ হাজার ৯ শত ২২টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে দুর্ঘটনা ঘটেছিল ১৫ হাজার ৫ শত ১৭টি। ছোট খাটো ঘটনা গুলোও এইসঙ্গে ধরা হয়েছে।

বিষ্ণুশর্ম্মার গল্প (২)

লোভে পাপ

মায়া তরফদার

অতো চাল! জমির ওপর বেওয়ারিশ ছড়ানো পড়ে রয়েছে। পায়রার দল আর লোভ সামলাতে পারলোনা। ঝুপ ঝাপ সব আকাশ থেকে নেমে এসে চাল খেতে আরম্ভ করলো। বুড়োপায়রা চিত্রগ্রীবের কথা কেউই শুনলো না। কিন্তু লোভের পথে পা বাড়িয়ে কি মুস্কিল না হলো!

পায়য়ার দল যেই চাল খেতে খেতে এগিয়ে গেল অমনি মাটিতে ছড়ানো জালের মধ্যে তাদেয় পা গেল আটকে। জালের মধ্যে আটকে গিয়ে প্রাণ ভয়ে পায়রাগুলো সুরু করলো চেঁচামেচি। বিপদে পড়ে একে অপরকে দোষ দিতে লাগলো। যে পায়রাটি প্রথমে চালের সন্ধান দিয়েছিলো তাকেই দোষ দিতে লাগলো সকলকে।

চিত্রগ্রীব দূর থেকে সবই দেখলো। তারই দলের পায়রা গুলির এই দূরবস্থায় সে আর স্থির থাকতে পারলোনা। হুস্ করে নেমে এলো সে বিপন্ন পায়রাগুলির কাছে। বললো—একটি দলের মধ্যে যদি কেউ অপর সকলকে কোন কাজে প্ররোচিত করে, তাতে যদি ফল ভাল হয়, সেটা সকলে সমান ভাগে ভোগ করে। আর যদি ফল খারাপ হয়, তাহলে তিরস্কার ভোগ করতে হয়' দোষী হিসাবে তাকে একা। সেইজন্য দলের একজনের

এখন সকলকে কোন কাজে প্ররোচিত করা উচিত নয়। এখন যা হবার তা হয়েছে, এখন বাক্ বিতণ্ডা করে ফল হবেনা কিছু।

"তাহলে এখন আমরা কি করব? কি করেই বা এই বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করবো?" —কাঁদ কাঁদ হয়ে পায়রাগুলো জিজ্ঞাসা করলো চিত্রগ্রীবকে।

চিত্রগ্রীব বললো, "যে বিপন্নদের উদ্ধারের চেষ্টা করে সেই প্রকৃত বন্ধু, আর যে বিপন্নদের শুধু তিরস্কারই করে সে দায়িত্ব এড়াতে চায়—প্রকৃত বন্ধুর পদবাচ্য নয়।"

জালের ভেতর থেকে পায়রাগুলো বললো, "আমরা আপনাকে প্রকৃত বন্ধু বলেই মনে করি, এখন আমাদের উদ্ধারের উপায় কি?"

একটু ভেবে নিয়ে বুড়ো চিত্রগ্রীব বললো, "দেখ; বিপদের সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া কোন কাজের কথা নয়। ধৈর্য্য ধর। দেখি কি করা যায়।"

চিত্রগ্রীব দেখলো যে জালের সুতো পায়রাগুলির পায়ে জড়িয়ে গেছে। একটু ভেবে নিয়ে বুড়ো পায়রা বললো—"দেখ এখন যদি এখানে বসে থাক তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাদের ব্যাধের হাতে ধরা পড়তে হবে। এখন সকলের আগে প্রাণ বাঁচাতে হবে। তাই সকলে মিলে চল জাল পায়ে ধ'রে আকাশে উড়ে যাই। দেখ ছোট যে, তারাও যদি এক জোট হয়ে কাজ করতে পারে তবে অনেক বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।"

অন্যান্য পায়রা ভেবে দেখলে যে প্রাণ বাঁচাতে হলে এ ছাড়া আর উপায় নেই। তখন সবাই মিলে জাল ঠোঁট দিয়ে ধরে আকাশে উড়তে লাগলো। দূরেই ব্যাধ লুকিয়ে ছিল—সে পাখীর এই কাণ্ড দেখে তাজ্জব বনে গেল।

আকাশে উড়ে পাখীরা জিজ্ঞাসা করে, "আমরা তো আকাশে উড়লাম কিন্তু এখন এই জালের বাঁধন পা থেকে কী করে ছাড়াবো?"

চিত্রগ্রীব বললো—"দেখ গণ্ডকী নদীর পারে আমার এক বন্ধু ইঁদুর বাস করে। তার নাম হলো হিরণ্যক। সে চিত্রবনে বাস করে। চল সেইখানে উড়ে যাই।

সেখানে গেলে হিরণ্যক তাদের এই দুর্দশা দেখে বললো—বন্ধু তোমাদের সকলের এই দুরবস্থা কেন?

চিত্রগ্রীব জানালো যে লোভের বসে কাজ করতে গিয়ে এদের এই দুর্দশা।

সব কথা শুনে হিরণ্যক বললো, এখন আমাকে কী করতে হবে?

চিত্রগ্রীব—তুমি এই সব পায়রাদের জাল কেটে উদ্ধার করো। হিরণ্যক তখন কুট কুট করে জাল কেটে সকলকে ছাড়িয়ে দিল।

একটা দুষ্টু কাক দূর থেকে ইঁদুরের ও পায়রার এইসব কাণ্ড দেখে মনে মনে ভাবলো ঐ ইঁদুরের সঙ্গে ভাব করা যায় কী করে? অনেকদিন অমন নাদুস নুদুস ইঁদুরও খায়নি!

কাক উড়ে এসে হিরণ্যকের কাছে এসে বললো যে সে তার সঙ্গে ভাব করতে চায়। কারণ এই বনে কেউ তার বন্ধু নেই। এদিকে কাককে দেখেই ইঁদুর গর্তের ভিতরে ঢুকে গেল এবং গর্তের মুখের কাছ থেকে উত্তর দিল—

দেখ বাপু সমানে সমানেই বন্ধুতা হয়। তাছাড়া তুমি আমাদের খেয়েই বেঁচে থাক। কাজেই ইঁদুরের সঙ্গে আমার ভাব কিরূপে হবে?

চল্‌বে

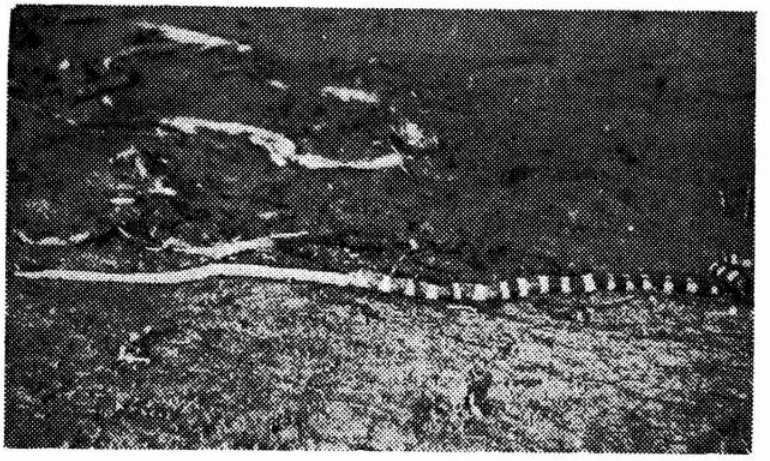

হল্‌দিবাড়ী (জলপাইগুড়ি) মিউনিসিপ্যাল খালে এই শঙ্খিনী সাপটি ধরা পড়ে। রাক্ষুসে সাপটি আর একটি সাপ মুখে পুরে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করছিল, এমন সময় ক্যামেরায় দৃশ্যটি ধরে রাখা হয়।

ছবি—অঘোর সোম

পরিচালিকা—**দিদিভাই**

দিদিভাইএর চিঠি

আমার ছোট্ট ভাই-বোনেরা,

দেখতে দেখতে শরৎ বিদায় নিলো। হেমন্তও বিদায় নেবার জন্য পা বাড়িয়েছে, দেখে যাচ্ছে তার হিমেল অঙ্গের পরশটুকু। এ সময়ে তোমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। শীতের মুখে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবার আশংকা খুবই বেশী। সামনে আবার বাৎসরিক পরীক্ষা—অসুখ করলে পরীক্ষার খুবই ক্ষতি হবে।

এ মাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর মধ্যে আছে গুরু নানকের, শহীদ ক্ষুদিরামের জন্মদিন আর ঋষি অরবিন্দের মৃত্যুদিন। গুরু নানক ছিলেন শিখ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। আর শহীদ ক্ষুদিরামের কথা নতুন করে বলবার কিছুই নেই। দেশের জন্য এই কিশোর বালক হাসিমুখে ফাসীর দড়ি গলায় বরণ করে নিয়েছিলো।

ঋষি অরবিন্দের কথা আগে তোমাদের কাছে বলা হয়েছে। তিনি শুধু স্বদেশ প্রেমিকই ছিলেন না। আধ্যাত্মিক আলোর সন্ধান দিয়ে গেছেন তিনি তাঁর দেশবাসীকে। আজও তাঁর প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিচেরীর আশ্রম তাঁর বাণী প্রচার করছে। মৃত্যু তাঁর নশ্বর দেহ গ্রাস করেছে বটে, কিন্তু তাঁর অমর আত্মার বাণী যুগ যুগ ধরে সনাতন ভারতবর্ষের অন্তরে গাঁথা হয়ে থাকবে।

তোমাদের মধ্যে যারা গ্রামাঞ্চলে থাকো তারা জানো, বারো মাসে তের পার্ব্বণ আজও পল্লী বাংলা থেকে উঠে যায়নি। হয়ত তোমাদের গ্রামের বাতাসে এখনও ছড়িয়ে রয়েছে, পাকা ধানের গন্ধ, ঘরে ঘরে সুরু হয়েছে নবান্ন উৎসব।

এই নবান্ন উৎসবটি বিশেষ করে ছিল পূর্ব্ববঙ্গেরই এক অপরিহার্য্য আনন্দ অনুষ্ঠান। নতুন ধান দিয়ে এই উৎসবের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হতো ঘরে ঘরে।

আজকের মত বিদায় নিচ্ছি।

তোমাদের শুভাকাঙ্খী—**দিদিভাই**

তোমাদের রচনা

রেলগাড়ী

সুমিত গাঙ্গুলী

ফোঁস ফোঁস ফোঁস ফোঁস
ছাড়ে নিঃশ্বাস,
রেলগাড়ী ছুটে চলে,
করে হাঁস ফাঁস
কত গ্রাম প্রান্তর
ছবি যেন নড়ছে,
খুসীর হাওয়ায় আজ
মন কেন ভরছে!
কু-কু-ঝিক্-ঝিক্
কত কিযে শব্দ,
বিজ্ঞানের হাতে পড়ে
দস্যু হলো জব্দ।

মাঝে মাঝে থামে গাড়ী
একে একে নামছে,
পুনরায় লোক নেয়
পুনরায় ছাড়ছে।
কেউ কেউ নেমে যায়
হাসি খুসি ভরা মন,
কারু কারু থাকেও—বা
দুঃখেতে মরা মন।
কখন বা ধোঁয়া আসে
কাশি মোরা খক্ খক্
রেলগাড়ী ছুটে চলে
ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্।

একটি ছোট গল্প

শ্রীনিলু

আগষ্ট বিপ্লব। বিয়াল্লিশের জন-জাগরণ। 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' পণ নিয়ে বন্ধন ভয় তুচ্ছ করে সারা ভারত মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দু'শ বছর ধরে বিদেশী শাসক যে নির্ম্মম অত্যাচার ও শোষণ নীতি চালিয়ে এসেছে তার ওপর চরম আঘাত হানবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে ভারতের জনসাধারণ। টেলিগ্রাফের তার কেটে, রেল লাইন উপড়ে ফেলে, থানা, পোষ্ট অফিস জ্বালিয়ে দিয়ে বিদেশী শাসকদের পর্য্যুদস্ত করতে তারা বদ্ধপরিকর।

মেদিনীপুরের তমলুক অঞ্চলে এই জনবিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন ৭২ বছরের এক বুড়ী। বিপ্লবের প্রথম দিনে মুক্তি সংগ্রামী জনতার এক বিরাট শোভাযাত্রা নিয়ে তিনরঙা জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন থানার দিকে। মাঝ রাস্তায় বিদেশী শাসকের সশস্ত্র সৈনিকেরা তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। বুড়ীকে উদ্দেশ্য করে বলল, "শোভাযাত্রা ভেঙে দাও, জনতা হটে যাও—নইলে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দাও।"

নির্ভীক বৃদ্ধা উত্তর দিলেন, পিছিয়ে যাওয়া আমাদের সংকল্প নয়, আমাদের সংকল্প 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

বুড়ীর কথা শেষ হলোনা, অত্যাচারীর বন্দুকগুলো গর্জ্জে উঠলো একসঙ্গে। দুটো গুলি এসে লাগলো তাঁর দু' হাতে। জাতীয় পতাকাটি তখনও তাঁর হাতে। কিন্তু একটুও বিচলিত হলেন না তিনি। প্রাণপণ শক্তিতে জাতীয় পতাকাটি চেপে ধরলেন। জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "ভাইসব, এগিয়ে চলো। যতক্ষণ না পর্য্যন্ত আমাদের শেষ সাথীটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে ততক্ষণ আমরা থামবো না।"

ক্ষিপ্ত জনতা এগিয়ে চললো সামনে। আবার গর্জ্জে উঠলো বন্দুক। একটি গুলি এসে বৃদ্ধার কপালে লাগলো। "বন্দেমাতরম্"—অস্ফুট শেষ ধ্বনিটুকু বৃদ্ধার মুখ থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন বৃদ্ধা। কিন্তু জাতীয় পতাকাটি তখনও তাঁর দৃঢ়-মুষ্টিতে আবদ্ধ। ধীরে ধীরে বৃদ্ধার হাত শিথিল হ'য়ে এলো।

জনতার মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এলেন। বৃদ্ধার শিথিল হাত থেকে তুলে নিলেন পতাকাটি। ওদিকে গুলি চল্‌তে লাগলো অবিরাম। একজনের পর একজন মৃত্যু বরণ করে, কিন্তু জাতীয় পতাকাটি চলে যায় পরবর্ত্তী শহীদের হাতে। সৈনিকের বন্দুক তুচ্ছ করে শেষ পর্য্যন্ত একজন থানার উপর উড়িয়ে দেয় শহীদের রক্তে রাঙা জাতীয় পতাকাটি।

আগষ্ট বিপ্লবের সেই স্মরণীয় দিনটিতে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে যে বৃদ্ধা জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা রক্ষা করেছিলেন তিনি কে বলতো?

[উত্তর পরের মাসে]

তোমাদের চিঠির উত্তর

রূপালী সোম (দেওঘর)—পাতা কমের জন্য উতলা হয়োনা। ভাল জিনিষের একটু ভালো।

হরেকৃষ্ণ আঢ্য (ভবানীপুর)—লেখা পাঠাও নিশ্চয়ই ছাপা হবে। তবে যে লেখা পাঠাবে একবার ভেবে দেখবে হিমাচলের ছাপার উপযুক্ত কিনা।

তরঙ্গিনী দেবী (বিলাসপুর)—খুব ভাল কথা, আপনি ছোটদের বিভাগেই লেখা পাঠাবেন।

অনন্ত বসাক (কামারপুকুর)—লেখাগুলো দেখে শুনে পাঠাবে। লাগে তুক্ না লাগে তাক্ ভেবে ছাড়বে না। প্রত্যেক লেখাটি এখানে বিচক্ষণতার সঙ্গে দেখা হয়। তারপর দোষ ত্রুটি শুধরে নেওয়া হয়, সেগুলো লেখক লেখিকাকে চিঠিতে জানানো হয়। এইভাবে যাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লেখার উন্নতি হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। হিমাচল যারা পড়ে তাদেরই লেখা ছাপা হয়।

স্নেহময় ঘোষ (জামসেদপুর)—ধাঁধার উত্তর দাতাদের নাম ছাপা হবে আরো কিছু দিন পর থেকে। এখন চিঠির জবাবে জানিয়ে দেওয়া হবে উত্তর ঠিক হয়েছে কিনা। এখন বেশী পাতা এই বিভাগে দেওয়ার অস্থবিধা হচ্ছে বলেই এই ব্যবস্থা হয়েছে।

হরিহর পাণ্ডা (ভুবনেশ্বর)—পত্রিকা পেতে দেরী হয় বলে তোমার ধৈর্য্য থাকেনা কথাটা আমরাও মেনে নিচ্ছি। কিন্তু একমাসের মধ্যেই তো পেয়ে থাকো। প্রথম সংখ্যা দেরীতে বেরিয়েছিল বলে পর পর সব সংখ্যাই দেরীতে বেরুচ্ছে। মাসের প্রথম সপ্তাহে বের করবার খুবই চেষ্টা করা হচ্ছে। দেখা যাক কবে তোমার কথা রাখতে পারবো।

নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (জলপাইগুড়ি)—কেন পারবে না? নিশ্চয়ই একদিন দেখবো তুমি খুব ভাল একজন লেখক হয়েছো। তোমাদের লেখার বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য আমরা আছি।

লতা মুখোপাধ্যায় (হরিহরপুর)—দুঃখ কোরোনা, কেউ তোমার লেখা ছাপেনা, হিমাচল ছাপবে। লেখা পাঠাও নিরুৎসাহী হয়োনা।

চন্দ্রা কর (খড়গপুর)—একটা লেখা পাঠিয়ে দেখনা কেন, হিমাচলের কাছ থেকে কি রকম উৎসাহ পাও।

শুভা দে বিশ্বাস—অতো বানান ভুল থাকলে লেখা কোন দিনই হবে না। আগে বানান ঠিক করো তারপর লেখার চেষ্টা করো।

বন্দনা, মনীষা, মনুয়া, গায়ত্রী, টুকাই, দেবু, হারু, স্বপ্না, রেবা, কানাই, গামা, পরেশ, শেফালী, রাণী, লক্ষ্মী ও মিছরী (গোরক্ষপুর)—তোমাদের ধাঁধার জবাব ঠিক হয়েছে। অত দেরীতে পাঠালে কিন্তু চলবে না।

ধাঁধা

১। উড়িতে পারি না আমি
পাখীর মতন,
হাত নাই পা নাই
নাহিক চেতন।
তবুও উড়িয়া বেড়াই
এদেশ ওদেশ
লক্ষ্যস্থলে গিয়ে থামি
আমি সর্ব্বশেষ।

—মুকু ঘোষ
কলকাতা।

২। বর্ত্তমান পৃথিবীর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্রকরে ব্যঙ্গ চিত্রকর এই ছবিটি এঁকেছেন বলতে পারো চিত্রকরের মনের কথা ?

৩। বনের আগেতে গিয়ে
'রা' যেই করি,
ছুটে আসে রাজা এক
রাক্ষস রূপ ধরি।

—মাধব পাল।

৪। মাতামহ জন্ম যবে
দিয়েছিল তারে
তখন তাহার মাতা
ছিল নাক ঘরে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। শ্রীনগর। ২। দ্বারভাঙ্গা। ৩। বাগান।

খবর বলছি !!

বঙ্গভুক্ত মানভূম—শেষ পর্য্যন্ত মানভূমের কিয়দংশ পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। আমাদের সোনার বাংলা আজ খণ্ডিত বিখণ্ডিত। সকলের সব দাবী মিটিয়ে যেটুকু পড়ে আছে তারই নাম পশ্চিম বাংলা। আর আমরা তাই নিয়েই সন্তুষ্ট। তারপর সংযুক্তির নামে বাংলা ভাষাভাষী খানিকটা অঞ্চলের বিলুপ্তির যে সর্ব্বনাশা প্রস্তাব এসেছিল তারই একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মানভূম আন্দোলনেরও পরিসমাপ্তি ঘটলো।

সংযুক্তির পর নূতন পশ্চিম বাংলাব মানচিত্র

এই সংযুক্তির ফলে আজ পশ্চিম বাংলার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তিন হাজার একশত সাতান্ন বর্গমাইল ব্যাপী জনবহুল এলাকা। তার সঙ্গে চৌদ্দ লক্ষ, ছেচল্লিশ হাজার তিন শত পঁচাশী নূতন নাগরিকও পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত হলো। আমরা এই নূতন নাগরিকদে প্রতি শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি।

নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি এখন থেকে বঙ্গভুক্ত মানভূম বলে ধরা হবে:—থানা ছালদা, জয়পুর, পুরুলিয়া, বলরামপুয়, হুড়া, আড়ষা, পুঞ্চা, বাঘমুণ্ডি, বরাবাজার, বান্দোয়ান, মাল-বাজার, রঘুনাথপুর, সাঁতুড়ি, নিতুড়িয়া, কাশীপুর ও পাড়া।

নিম্নলিখিত থানাগুলি বিহারের মধ্যে থেকে গেল:—চাণ্ডিল, ইঁটাগড়, পটমদা, চাষ ও চন্দনকিয়ারী।

নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন

নিঃ ভাঃ কংগ্রেসের তিনদিনব্যাপী অধিবেশন কলকাতায় হয়ে গেল। বেলিয়াঘাটায় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড আর নারকেলডাঙ্গা মেন রোডের সংযোগস্থলে ত্রিশ বিঘার জমির উপর এক বিরাট মণ্ডপ নির্ম্মাণ করা হয়েছিল এই উপলক্ষে। মূল অধিবেশনের মণ্ডপটি ৫০ হাজার জনতার উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছিল।

কংগ্রেসের অধিবেশনের মণ্ডপটিতে কার্ণিভাল বা মেলার রূপই ফুটে উঠেছিল বিশেষভাবে। সেইজন্যই অধিবেশন মণ্ডপটি আরো বেশী আকর্ষণীয় হয়েছিল জনতার কাছে।

কংগ্রেস ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী ও জাতীয় জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থা বা পার্টি। ছত্রিশ কোটী ভারতবাসীর রক্ষা, পালন, শাসন জাতীয় জীবনে উন্নতির ভার নিয়েছে কংগ্রেস। এখন রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির দিক দিয়ে বিশ্বের সম্মুখে এক জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভারতও এই সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। ভারতের এই জটিল সমস্যার মীমাংসার ভার নিয়েছেন কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন নেতা এই নেতাদের ওপর দেশবাসীর আস্থা পরিপূর্ণভাবেই আছে। অধিবেশন মণ্ডপে জনতার আধিক্যও ঐ কথা প্রমাণ করে।

অধিবেশন মণ্ডপের অভিমুখে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। ছবি—পান্না সেন

কাজে কাজেই আশা করা যায় যে কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অচিরেই ভারতকে সকল সমস্যা থেকে মুক্ত করে তুলবে।

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে (শনিবার, ১০ই নভেম্বর) কলকাতার ময়দান সভায় শ্রীনেহরু বর্ত্তমান সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ দেশ গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন দেশবাসীর কাছে। আশাকরি শ্রীনেহরুর এই আহ্বান সফল হবে।

ষোড়শ অলিম্পিকের উদ্বোধন—মেলবোর্ণে ১৬শ অলিম্পিকের ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন হলো গত ২২শে নভেম্বর। ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানকারী ৬৯টি দেশের ৪ হাজার প্রতিযোগির উপস্থিতিতে আর এক লক্ষ দশ হাজার দর্শক সমাগমে পূর্ণ অলিম্পিক ষ্টেডিয়ামটি একটি আড়ম্বর পূর্ণ পরিবেশের মাঝে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে এমন সময়ে বেলা ৪টা ৩৭ মিনিটের সময় এডিনবরার ডিউক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষনা করলেন।

প্রথমে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিদের একটি মিছিল কুচকাওয়াজ করে ষ্টেডিয়ামের কিয়দংশ পরিভ্রমণ করলো, তার পুরোভাগে ছিলেন অলিম্পিকের প্রবর্ত্তক গ্রীসদেশের প্রতিনিধি বর্গ। শান্তি ও মৈত্রীর প্রতীক ৫ হাজার সাদা পায়রা উড়িয়ে দেওয়া হলো। তারা ষ্টেডিয়ামের ওপর চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ঐ কথাই প্রচার করলো।

স্থানাভাবে বহু দর্শককে বিফল হয়ে ফিরে যাওয়ার সংবাদ ও শোনা গেল। দাঁড়িয়ে খেলা দেখার আসনের টিকিটের দাম ছয় শিলিং। এই টিকিটগুলি কালোবাজারে ৪ পাউণ্ড পর্য্যন্ত দামে বিক্রী হয়েছে। কোন কোন দর্শক টিকিট না পেয়ে বসে দেখবার একটি টিকিটের জন্য ২০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ব্যয় করেছেন আবার কেউ কেউ বা তাঁদের জামার ওপর বিজ্ঞাপন লিখে রেখেছিলেন—"যে কোন দামে টিকিট কিনতে রাজী আছি।"

পরলোকে শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত—স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা জ্ঞান তপস্বী পণ্ডিত শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত রবিবার ১৫ই অক্টোবর রাত্রি ১২-৪০ মিঃ সময় উত্তর কোলকাতার, নিজ বাস ভবনে, সন্যাস রোগে অক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুকালে তার ৮৮ বৎসর বয়স হয়েছিল। পরদিন সোমবার বেলা আড়াইটায় নিমতলা শ্মশান ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। শোকযাত্রায় পাঁচ শতাধিক লোক যোগদান করেন।

সংক্ষিপ্ত জীবন কথা—

১২৭৫ বঙ্গাব্দের ২৯শে শ্রাবণ কোলকাতায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

মেট্রপলিটন স্কুল থেকে এণ্ট্রাস ও জেনারেল এসেম্বলি থেকে এফ, এ পাশ করার পর তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আইন পড়ার জন্য ইংলণ্ড গমন করেন। কৈশোরে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব,

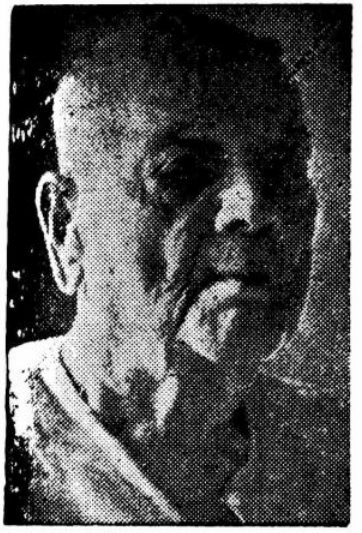

মহেন্দ্র নাথ দত্ত

ড়াঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ফাদার লাঁফো প্রভৃতি মহাপুরুষদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবেকানন্দের মতো তিনিও সত্যনিষ্ঠ, ধার্মিক, দার্শনিক ও জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। বিবেকানন্দের কাছে উৎসাহ না পেয়ে তিনি আইন পড়া ত্যাগ করেন এবং বৃটিশ মিউজিয়ামে দর্শন শাস্ত্র চর্চ্চা সুরু করেন।

স্বামীজির দেহত্যাগের পর তিনি ভারতবর্ষে ফেরেন এবং সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় বহু ধর্ম্মপুস্তক রচনা করেছিলেন। দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অর্দ্ধশতাধিক পুস্তক আছে এবং প্রকাশের অপেক্ষায় আরো বহু গ্রন্থ এখনো রচিত আছে।

তাঁর মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি হারাল।

শ্রীবসন্তলাল মুরারকা—গত ১০ই অক্টোবর সকাল সাড়ে দশটায় বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীবসন্তলাল মুরারকা এম, এল, এ (কংগ্রেস) তাঁর কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৪ বৎসর হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

ইনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত মুকুন্দগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় তিনি অধ্যয়নের জন্য আসেন। ১৯৩৫ সালে তিনি গান্ধীজি প্রবর্ত্তিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩২ সালে ইনি পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় তিনি বীরভূম জেলা থেকে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

মুরারকাজী সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহনের প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

এক নজরে নুতন ভারত—

রাজ্য ও রাজধানী	রাজ্যপাল	মুখ্যমন্ত্রী
১। মহীশূর (বাঙ্গালোর)	মহীশূরের মহারাজা	শ্রী এস. নিজলিঙ্গাপা
২। রাজস্থান (জয়পুর)	শ্রীগুরুমুখ নিহাল সিং	শ্রীমোহনলাল সুখাড়িয়া
৩। কেরালা (ত্রিবান্দ্রম)	ডাঃ বি রামকৃষ্ণরাও	রাষ্ট্রপতির শাসন
৪। অন্ধ্র (হায়দ্রাবাদ)	শ্রীচণ্ডুলাল ত্রিবেদী	শ্রী এন সঞ্জীব রেড্ডী
৫। বোম্বাই (বোম্বাই)	শ্রীশ্রীপ্রকাশ	শ্রী ওয়াই, বি চবন
৬। মধ্যপ্রদেশ (ভুপাল)	ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া	পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল
৭। পাঞ্জাব (চণ্ডীগড়)	ডাঃ সি, পিএন সিংহ	সর্দার প্রতাপ সিং কায়রণ
৮। উড়িষ্যা (ভুবনেশ্বর)	শ্রীভীমসেন সাচার	ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব
৯। আসাম (শিলং)	শ্রীফজল আলী	শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী
১০। পশ্চিমবঙ্গ (কলিকাতা)	শ্রীমতি পদ্মজা নাইডু	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
১১। বিহার (পাটনা)	শ্রী আর, আর দিবাকর	ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিং
১২। উত্তরপ্রদেশ (লক্ষ্ণৌ)	শ্রী কে, এম মুন্সী	ডাঃ সম্পুর্ণানন্দ
১৩। মাদ্রাজ (মাদ্রাজ)	এ, জে, জন	শ্রীকামরাজ নাদার
১৪। জম্মু ও কাশ্মীর (শ্রীনগর)	যুবরাজ করণ সিংহ	বক্সী গোলাম মহম্মদ

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	**প্রশাসক**
১। দিল্লী (দিল্লী)	শ্রী এ, ভি, পণ্ডিত
২। হিমাচল প্রদেশ (সিমলা)	রাজা বজরঙ্গ বাহাদুর সিং
৩। ত্রিপুরা (আগরতলা)	শ্রী কে, পি, ভার্গব
৪। মণিপুর (ইম্ফল)	শ্রী পি, সি, ম্যাথু
৫। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (পোর্টব্লেয়ার)	শ্রী টি, জি, এন আয়ার
৬। লাক্ষা দ্বীপ, মিনিকয়, আমিনদিভ দ্বীপপুঞ্জ	শ্রী টি, মোন

-।-।-।-।-

৩৭৬ পাতার উত্তর—পাঁচ মিনিট। **৩৮২ পাতার উত্তর**—(১) জল। (২) তোমার বয়স।

সম্পাদক—**শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়** সহকারী—**শ্রীজয়শ্রী বসু**
শিল্পীবৃন্দ—**শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তি, শ্রীসমীর ঘোষ**। শ্রীধর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৩নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩ হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।